বাংলাদেশের নির্বাচিত ছোটদের হাসির গল্প

প্রথম খণ্ড

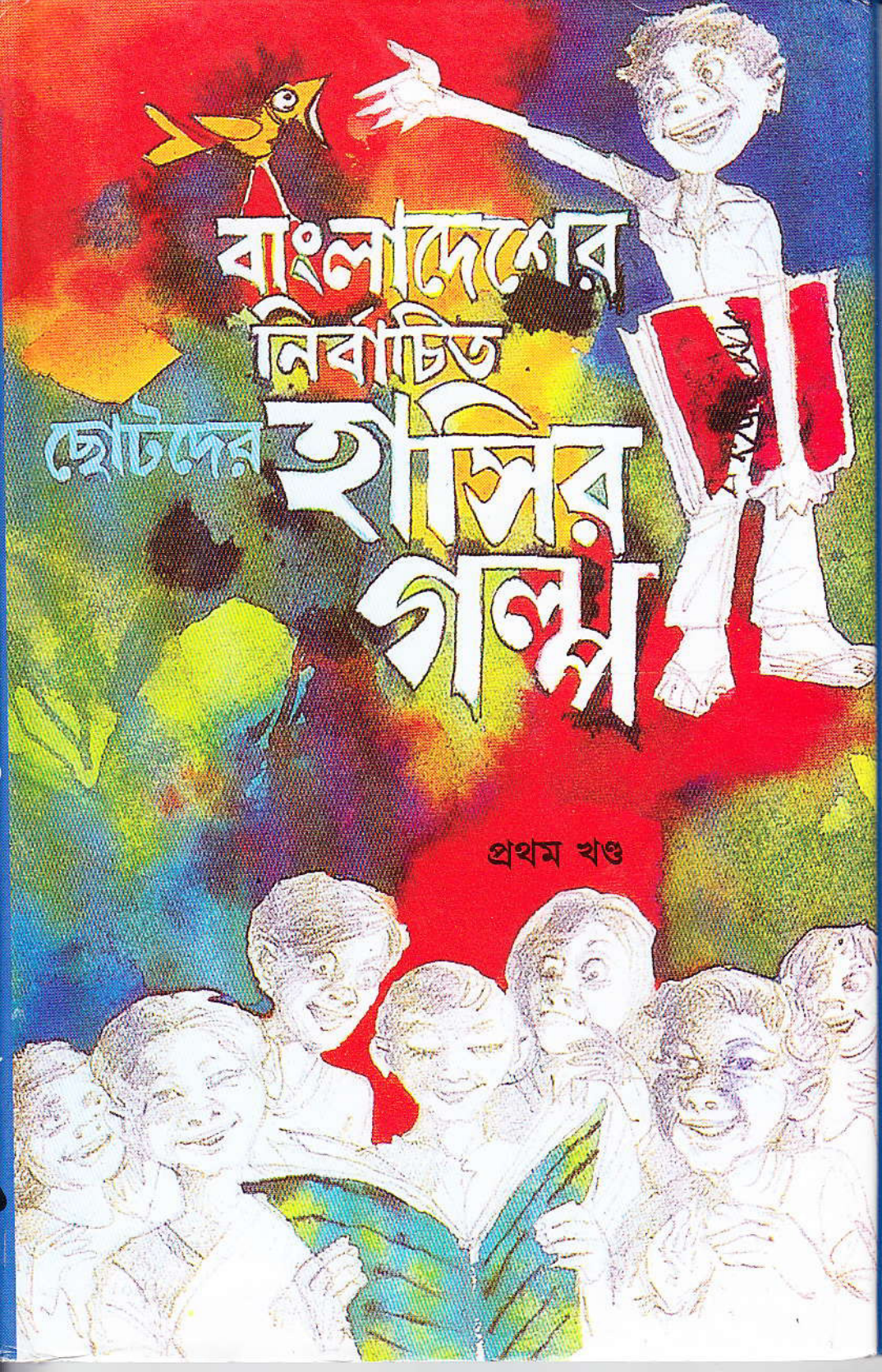

আলোকিত মানুষ চাই

বাংলাদেশের নির্বাচিত ছোটদের হাসির গল্প

প্রথম খণ্ড

সম্পাদনা

আহমাদ মাযহার

আমীরুল ইসলাম

পাঠাভ্যাস উন্নয়ন কর্মসূচি
অভ্যর্থনা নং:
গ্রন্থাগার : বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্র
EP

বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্র

বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্র প্রকাশনা ৯

গ্রন্থমালা সম্পাদক
আবদুল্লাহ আবু সায়ীদ

প্রথম বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্র সংস্করণ
ফাল্গুন ১৩৯৫ ফেব্রুয়ারি ১৯৮৯

চতুর্থ সংস্করণ দশম মুদ্রণ
পৌষ ১৪১৭ ডিসেম্বর ২০১০

প্রকাশক
মোঃ আলাউদ্দিন সরকার
বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্র
১৪ কাজী নজরুল ইসলাম এভিনিউ
ঢাকা ১০০০ ফোন ৯৬৬০৮১২ ৮৬১৮৫৬৭

মুদ্রণ
নিজাম প্রিন্টার্স এ্যান্ড প্যাকেজেস
২৪, পুরানা পল্টন লেন, ঢাকা ১০০০

প্রচ্ছদ
হাশেম খান

মূল্য
পঁচাত্তর টাকা মাত্র

ISBN-984-18-0008-x

গত চার দশকে বাংলাদেশের সাহিত্যিকদের হাতে
শিশু-কিশোরদের জন্য যেসব হাসির গল্প রচিত হয়েছে
তারই একটি প্রতিনিধিত্বশীল সংকলন উপহার দেয়ার উদ্দেশ্যে
বাংলাদেশের নির্বাচিত ছোটদের হাসির গল্প প্রকাশের
উদ্যোগ নেয়া হল। দুই খণ্ডে প্রকাশিত এই সংকলনের
প্রথম খণ্ডে গত চার দশকের অপেক্ষাকৃত প্রবীণ লেখকদের
রচনা সংকলিত হয়েছে।

সূচি

সমানে সমান ॥ জসীমউদ্‌দীন ৯
দীক্ষা ॥ মোহাম্মদ নাসির আলী ১৪
ফলাফল ॥ শওকত ওসমান ২০
উল্টো শার্লক হোম্‌স্‌ ॥ সাজেদুল করিম ২৪
গুণের আদর ॥ গোলাম রহমান ২৯
ঘুম তাড়ানোর গল্প ॥ হাবীবুর রহমান ৩৩
স্ট্যান্ডোফবিয়া ॥ রাহাত খান ৪১
আক্কেল গুড়ুম ॥ আবদুশ শাকুর ৫৩

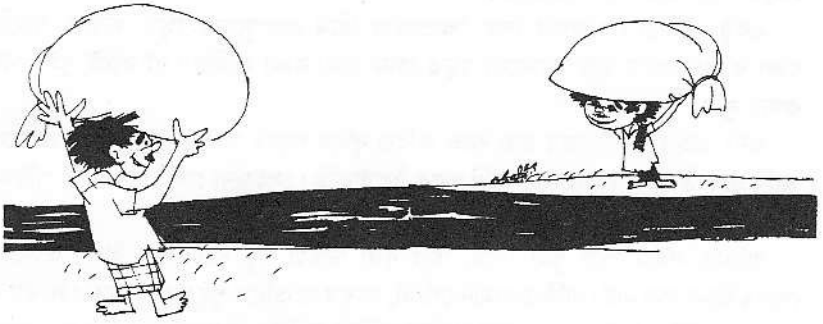

সমানে সমান

জসীমউদ্‌দীন

ছোট্ট একটা নদী, হাঁটিয়াই পার হওয়া যায়। তার পশ্চিম পারে থাকে এক ট্যাটন, নাম ধূলি। পুব পারে থাকে আর এক ট্যাটন, নাম তার বালি। ট্যাটন মানে অতি চালাক। লোক ঠকাইয়া বেড়ানোই তাহার পেশা।

বালি এক ছালা বিচেকলার বীজ মাথায় লইয়া নদীর ওপার দিয়া যাইতেছে। পশ্চিম পারের ট্যাটন ধূলি তেমনি আর-এক ছালা গাবের পাতা মাথায় করিয়া নদীর এপার দিয়া যাইতেছে। কেউ কাহাকে জানে না।

ধূলি বালিকে ডাক দিয়া জিজ্ঞাসা করিল, 'তোমার ছালায় কী লইয়া যাইতেছ?'

বালি উত্তর করিল, 'একবস্তা গোলমরিচ লইয়া চলিয়াছি হাটে। তোমার মাথায় কী লইয়া যাইতেছ ভাই?'

ধূলি বলিল, 'এক ছালা তেজপাতা লইয়া চলিয়াছি হাটে।'

দুইজনে নদীর এপার-ওপার পথ ধরিয়া চলিতেছে। আর প্রত্যেকে প্রত্যেকের বুদ্ধিতে শান দিতেছে, কী করিয়া একে অপরকে ঠকাইবে। ধূলি ভাবে, যদি আমার গাবের পাতার বস্তা বদল করিয়া ওর গোলমরিচের বস্তা লইতে পারিতাম! বালি ভাবে, যদি আমার কলার বীজের বস্তা

বদল করিয়া ওর তেজপাতার বস্তা লইতে পারিতাম ! কিন্তু কেউ কাহাকে কিছু বলে না, কেবল মনে মনে নানা ফন্দিফিকির আঁটে ! আর এ-কথা সে-কথা বলিয়া এ-ওর আপন হইতে চায়।

অনেকক্ষণ পর বালি ধূলিকে বলে, 'আচ্ছা ভাই ! তোমার সঙ্গে যখন এতই খাতির হইল, আইস আমরা একে অন্যের বোঝা বদলাবদলি করি।'

ধূলি তো তাহাই চায় ! সে তাহার গাবের পাতার বস্তার বদলে যদি গোলমরিচের বস্তা লইতে পারে তবে তো পোয়াবারো।

একটু কাশিয়া সে জবাব দেয়, 'আগেকার দিনে রাজপুত্রেরা বন্ধুত্ব করিতে পাগড়ি বদল করিত, এসো ভাই আমাদের বন্ধুত্ব হোক ছালা বদল করিয়া।' দুইজনেই দুইজনের কথায় খুশি।

বালি তাহার কলাবীজের বস্তা বদল করিয়া ধূলির গাবের পাতার বস্তা লইল। এ বলে আমি ওকে ঠকাইয়াছি। ও বলে আমি তাকে ঠকাইয়াছি ! সেইজন্য কেউ কারো বস্তা পরীক্ষা করিল না।

বাড়িতে লইয়া গিয়া ধূলি দেখে, তার বস্তা ভরিয়া শুধু বিচেকলার বীজ। একটাও গোলমরিচের দানা নাই। বালিও তেমনি দেখিল, তার বস্তা ভরিয়া শুধু গাবের পাতা। প্রত্যেকে মনে মনে হাসিল, আর এ-ওর বুদ্ধির তারিফ করিতে লাগিল। কিন্তু দুইজনে মনে মনে ফন্দি আঁটিতে লাগিল, কী করিয়া একে অপরকে ঠকাইবে।

পরদিন ভোরবেলায় বালি নদীর ওপারে চুলা জ্বালাইয়া তার ওপরে এক হাঁড়ি গরম পানি জ্বাল দিতে লাগিল। নদীর এপার হইতে ধূলি ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করিল, 'দোস্ত ! কী করিতেছ ?' বালি উত্তর করিল, 'তোমার সঙ্গে গোলমরিচের বস্তা বদল করিয়া তেজপাতা লইয়া হাটে গিয়াছিলাম। আমার বেশ লাভ হইয়াছে। তাই সকাল-সকাল ভাত রান্না করিতেছি।'

ধূলি বলিল, 'আমিও ভাই তোমার গোলমরিচ বেচিয়া বেশকিছু পাইয়াছি। কিন্তু আমার তো চুলা নাই। আমার কাছে কিছু চাউল আছে। তোমার হাঁড়ির মধ্যে ছাড়িয়া দেই। দুইজনে একসঙ্গে ভাত খাইব।'

বালি ভাবিল, 'তা মন্দ কী ! আমি তো শুধু পানি সিদ্ধ করিতেছি ! ও যদি এর মধ্যে কিছু চাউল ছাড়িয়া দেয়, তবে ওর ওপর দিয়াই আজিকার সকালের আহারটা সারিয়া লইব।'

প্রকাশ্যে বলিল, 'তা বেশ তো, তোমার চাউল লইয়া আইস। আমরা একসঙ্গে রান্না করিয়া খাই।'

নদীতে পানি অল্প। হাঁটিয়াই পার হওয়া যায়। এপার হইতে ধূলি আসিয়া সেই উনানের পাশে বসিল। বালি যেই একটু ওদিকে তাকাইয়াছে, অমনি ধূলি তার কাপড়ের এক কানি একটা পোঁটলার মতো করিয়া ধরিল, যেন বালি বুঝিতে পারে তার মধ্যে চাউল আছে। তারপর বালিকে বলিল, 'দেখ—দেখ ভাই। আকাশ দিয়া কেমন একটা পাখি যাইতেছে।'

পুব পারের ট্যাটন একটু চাহিয়াছে, অমনি ধূলি তার কাপড়ের পুঁটলি খুলিয়া হাঁড়ির মধ্যে চাউল ঢালিতেছে এরূপ ভান করিয়া কাপড় ঝাড়া দিতে লাগিল। তারপর হাঁড়ির মুখে ঢাকনা দিয়া দুইজনে চুলায় জ্বাল দিতে লাগিল।

অনেকক্ষণ চুলায় জ্বাল দিয়া যখন তাহারা ঢাকনি খুলিল, তখন দেখা গেল হাঁড়ির মধ্যে শুধুই গরম পানি সিদ্ধ হইতেছে। একটাও ভাত নাই। একে অপরের মুখ চাওয়াচাওয়ি করিয়া তাহারা সবই বুঝিতে পারিল।

বালি তখন ধূলিকে বলিল, 'দেখ ভাই। এখন সত্যই বুঝিতে পারিলাম, আমরা কেহ কাহারো চাইতে বুদ্ধিতে কম না। আমাদের এই মূল্যবান বুদ্ধি একে অপরের ওপর ছাড়িয়া শুধুই সময় নষ্ট করিতেছি। এসো আমরা সত্যিকার বন্ধু হই। আমাদের দুইজনের বুদ্ধি একসঙ্গে ব্যবহার করিলে আমরা অনেক লাভ করিতে পারিব।'

ধূলি বলিল, 'বেশ ভাই! আমি তাহাতে রাজি আছি।'

তখন দুই বন্ধু অনেক পরামর্শ করিয়া এদেশ ছাড়িয়া বহুদূরে আর-এক দেশে চলিয়া গেল।

সেখানে যাইয়া শুনিল, এক বিদেশি সওদাগর কিছুদিন হইল মারা গিয়াছে। তাহার টাকা-পয়সার অন্ত ছিল না। আত্মীয়স্বজনেরা তাহা ভাগবাটোয়ারা করিয়া লইয়াছে।

এক গাছতলায় বসিয়া দুই ট্যাটন নানারকম ফন্দিফিকির করিতে যাইয়া ডাক ছাড়িয়া কাঁদিতে লাগিল। তারপর রাত্র হইলে সেই লোকটির কবর খুঁড়িয়া তার মধ্যে ধূলি লুকাইয়া রহিল।

পরদিন সকালবেলায় বালি সেই সওদাগরের বাড়ির সামনে যাইয়া ডাক ছাড়িয়া কাঁদিতে লাগিল। তাহার কান্না শুনিয়া পাড়ার সকলে আসিয়া জিজ্ঞাসা করিল, 'তুমি কাঁদো কেন?'

সে বলিল, 'এ-বাড়ির সওদাগর সাহেব ছিলেন আমার পিতা। তাঁর মরার খবর শুনিয়া আমি অমুক দেশ হইতে আসিয়াছি। কিন্তু আমার পিতার সমস্ত সম্পত্তি অপরে দখল করিয়া লইয়াছে। আমার জন্য কিছুই রাখে নাই।' এই বলিয়া সে আবার কাঁদিতে লাগিল।

বিদেশি লোক বলিয়া সবারই একটু দয়ার ভাব! আর লোকটি অমন ইনাইয়া বিনাইয়া কাঁদিতেছে! তাহার কান্না শুনিয়া সকলের চোখে পানি আসিল।

কিন্তু সওদাগরের আত্মীয়স্বজনেরা বলিল, 'ও যে সওদাগরের ছেলে তার প্রমাণ কী?'

বালি তখন কান্না থামাইয়া বলিল, 'আমার পিতা আমাদের দেশে যাইয়া আমার মাকে বিবাহ করিয়াছিলেন। তারপর এদেশে আসিয়া আমাদের খবর লন নাই। আমি বিদেশী লোক। প্রমাণ কোথায় পাইব? মৌলবী সাহেবরা বলেন, মরা ব্যক্তির জান তার কবরের মধ্যে লুকাইয়া থাকে। আপনজনের ডাকে তাহারা কখনো কখনো গায়েবি আওয়াজ করিয়া থাকেন। আসুন আপনারা আমার সঙ্গে। বাপজানের কবরের কাছে যাইয়া একবার তাহাকে ডাক দেই। যদি তিনি কথা বলেন, তবে প্রমাণ হইবে আমি তাঁর সত্যিকার ছেলে।'

এ-কথা শুনিয়া সকলেই রাজি হইল। কবরের কাছে আসিয়া বালি ডাক ছাড়িয়া কাঁদিতে লাগিল, 'বাপজান গো! তুমি মরিয়া গিয়াছ। আমাকে কিছু দিয়া যাও নাই। আমি যদি তোমার সত্যিকার ছেলে হই, তবে আমার ডাকে সাড়া দাও।'

গাঁয়ের লোকেরা অবাক হইয়া শুনিল, কবরের ভিতর হইতে গোঁ গোঁ আওয়াজ হইতেছে। বালি তখন বলিল, 'বাপজান গো! তোমার টাকাপয়সা সকলে ভাগ করিয়া লইয়াছে। আমার কিছুই নাই। আমাকে কিছু দিয়া দাও।'

কবরের ভিতর হইতে ধূলি আওয়াজ করিল, 'ও আমার সত্যিকার ছেলে। তোমরা ওকে সাত ছালা টাকা দাও। নতুবা তোমাদের খারাপ হইবে।'

সওদাগরের আত্মীয়স্বজনেরা গ্রামবাসীদের সঙ্গে পরামর্শ করিয়া বালিকে সাত ছালা টাকা দিয়া দিল। সেই টাকা গনিয়া-গাঁথিয়া ছালায় পুরিয়া একটা গরুর গাড়িতে বোঝাই করিয়া বালি বাড়ি রওনা হইল।

ধূলি কবরের মধ্যেই পড়িয়া রহিল। একবারও বালি তাহার কথা মনে করিল না। দুপুরবেলায়, যখন কবরের কাছে কোনো জনমানব নাই, সেই সময় ধূলি কবর হইতে উঠিয়া জানিল, বালি আগেভাগেই টাকা লইয়া চলিয়া গিয়াছে।

সে তখন শহরের দোকান হইতে খুব দামি একজোড়া জরির জুতা কিনিল; তারপর যে-পথ দিয়া বালি গরুর গাড়ি লইয়া গিয়াছিল, তাহারই চাকার দাগ দেখিয়া দৌড়াইতে লাগিল। অল্পক্ষণের মধ্যে সে বালির কাছাকাছি আসিয়া পৌঁছিল এবং অন্যপথে ঘুরিয়া দৌড়াইয়া তার খানিকটা সামনে যাইয়া একখানা জরির জুতা পথের মধ্যে রাখিয়া দিল।

তারপর আরো মাইলখানেক যাইয়া অপর জুতাখানা পথের আর-এক জায়গায় রাখিয়া দিয়া সে একটা ঝোপের মধ্যে লুকাইয়া রহিল।

বালি গরুর গাড়ি লইয়া যাইতে দেখে পথের মধ্যে একখানা সুন্দর জুতা পড়িয়া রহিয়াছে। কিন্তু একখানা জুতা দিয়া কী কাজ হইবে? পরিতে তো পারিবে না। জুতাখানা নাড়িয়া চাড়িয়া সে পথের মধ্যে ফেলিয়া দিল।

তারপর মাইলখানেক দূরে যাইয়া সে আর-একখানা জুতা দেখিতে পাইল। তখন সে ভাবিল, 'আগের জুতাখানা যদি সঙ্গে আনিতাম, তবে তো দুইখানা একত্র করিয়া বেশ পায়ে দিতে পারিতাম। আর এই জুতাখানা আমার পায়েও বেশ লাগসই।' তখন সে গাড়ি থামাইয়া আগের জুতাখানা আনিবার জন্য দৌড় দিল।

ইতিমধ্যে ঝোপের আড়াল হইতে ধূলি আসিয়া গরুর গাড়িতে উঠিয়া টাকাসমেত গাড়িখানা বাড়ির পথে চালাইয়া দিল।

এদিকে বালি দৌড়াইয়া আসিয়া গাড়ির কোনো খোঁজ পাইল না। সে তখন বুঝিতে পারিল, নিশ্চয়ই ইহা ধূলির কাজ। সে দৌড়াইতে দৌড়াইতে ধূলির বাড়ির দিকে ছুটিল।

ধূলি টাকাপয়সা গনিয়া-গাঁথিয়া মাটির তলে পুঁতিয়া শুইবার আয়োজন করিতেছে; এমন সময় বালি আসিয়া বলিল, 'দোস্ত! সবই বুঝিয়াছি। এবার টাকাপয়সা ভাগ করিবার আয়োজন করো।'

ধূলি বলিল, 'দোস্ত। রাত অনেক হইয়াছে। কাল সকালে আসিও। দুইজনে টাকাপয়সা ভাগ করিয়া লইব।'

সারারাত জাগিয়া ধূলি তার বউয়ের সঙ্গে শলাপরামর্শ করিতে লাগিল, কী করিয়া বালিকে ঠকাইয়া সাত বস্তা টাকাই সে নিজে লইবে।

পরদিন সকালে বালি আসিয়া যখন তার দরজায় ঘা দিল, বউ তখন ডাক ছাড়িয়া কাঁদিয়া উঠিল, 'আজ রাত্রে তোমার দোস্ত মারা গিয়াছে। আমি এখন কোথায় যাইব গো!'

বালি জিজ্ঞাসা করিল, 'দোস্ত মরিবার আগে টাকাপয়সার কথা কিছু বলিয়াছে? সাত ছালা টাকা আমরা কাল লোক ঠকাইয়া আনিয়াছি।'

বউ তো যেন আসমান হইতে পড়িল! 'কই, না তো, সাত ছালা টাকা! আমাদের ঘরে একটা আধলা পয়সা পর্যন্ত নাই। ও গো, আমি কেমন করিয়া বাঁচিব গো। কে আমাকে খাওয়াইবে গো!'

বালি সবই বুঝিল। সে বলিল, 'বউ! তুমি কাঁদিও না। আমি তোমাকে বিপদে আপদে দেখিব। আমার দোস্ত যখন মরিয়াই গিয়াছে, আমি কবর দিয়া আসি।'

এই বলিয়া সে ধূলির পায়ে দড়ি বাঁধিয়া টানিয়া লইয়া চলিল। টানিতে টানিতে তাহাকে কাঁটাগাছের মধ্যে দিয়া লইয়া যায়। ইটাক্ষেতের মধ্যে দিয়া লইয়া যায়। কাঁটার খোঁচায়, ইটের ঘসায় তাহার হাত-পা ক্ষতবিক্ষত হইয়া যায়, তবু ধূলি কথা বলে না। কথা বলিলেই তো সাত বস্তা টাকার ভাগ দিতে হইবে!

এমনি করিয়া টানাটানিতে দুপুর গড়াইয়া সন্ধ্যা হইল। সন্ধ্যা গড়াইয়া রাত হইল। কিন্তু তবুও ধূলি কথা বলে না। তখন তাহারা আসিয়া পড়িয়াছে এক বনের ভিতর। এখন অন্ধকারে বাড়ি ফিরিবারও উপায় নাই। বালি ধূলিকে এক গাছতলায় রাখিয়া, সে নিজে গাছের ডালে উঠিয়া বসিয়া রহিল।

সে-পথ দিয়া একদল ডাকাত ডাকাতি করিতে যাইতেছিল। তাহারা দেখিতে পাইল, গাছের তলায় একটি মড়া পড়িয়া রহিয়াছে। দেখিয়া ডাকাতের সর্দার বলিল, 'আজ বড় শুভ যাত্রারে ভাই! পথে একটি মড়া দেখিতে পাইলাম।' এই বলিয়া তাহারা চলিয়া গেল।

রাত প্রায় শেষ হইয়া আসিয়াছে; ডাকাতেরা সাত বস্তা টাকা ডাকাতি করিয়া আনিয়াছে।

ফিরিবার সময় তাহারা এই গাছের তলায় আসিয়া টাকা ভাগ করিতে লাগিল। ডাকাতের সর্দার বলিল, 'দেখ ভাই! এই মড়াটা দেখিয়াছিলাম বলিয়াই আজ আমরা এত টাকা পাইলাম। এক কাজ করি, একে আমাদের টাকার একটা ভাগ দেই।' অপর ডাকাত বলিল, 'ও তো মরিয়া গিয়াছে, ওকে টাকা দিলে কাল হয়তো অপর কেহ আসিয়া লইয়া যাইবে। ও আর ভোগ করিতে পারিবে না। তার চাইতে এসো ভাই এক কাজ করি, ওকে এখানে কবর খুঁড়িয়া মাটি দিয়া যাই।'

তখন সকল ডাকাত একটি কবর খুঁড়িয়া যেই মড়াটিকে কবরে নামাইয়া দিবে, অমনি ধূলি হাত-পা আছড়াইয়া চিৎকার করিয়া উঠিয়াছে। গাছের ওপর হইতে বালি তাদের ঘাড়ে লাফাইয়া পড়িয়াছে। ভয়ের চোটে টাকাপয়সা ফেলিয়া সমস্ত ডাকাত দে চম্পট।

তখন দুই বন্ধু হাসিতে হাসিতে এ-ওর সঙ্গে কোলাকুলি করিল।

তারপর সেই সাত বস্তা টাকা আগের সাত বস্তার সাথে যোগ করিয়া তাহারা সমান সমান ভাগ করিয়া লইল।

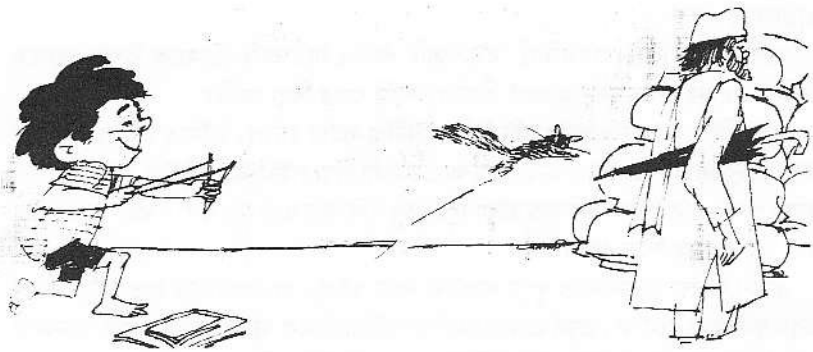

দীক্ষা

মোহাম্মদ নাসির আলী

স্কুলে বরাবর বাংলা পড়ান সতুবাবু—সতীনাথ বোস। তিনি সেদিন গর-হাজির। হেডমাস্টার মশাই তাই মৌলবী সাহেবকে ডেকে বললেন, 'সতুবাবু আজ আসেননি দেখছি। ফোর্থ ক্লাসে আজকে বাংলার পিরিয়ডটা আপনিই কোনোরকমে চালিয়ে দিন গে, কেমন?'

'জি, আচ্ছা।' বলে মৌলবী সাহেব রাজি হয়ে গেলেন। রাজি হলেন সত্যি কিন্তু মনে মনে প্রমাদ গুনলেন। একে তো পড়াতে হবে বাংলা তাও আবার ফোর্থ ক্লাসে অর্থাৎ দুষ্টের শিরোমনি লেবুদের ক্লাসে।

মৌলবী সাহেব সরল গোবেচারি গোছের লোক। ধর্মপ্রাণ এই নিরীহ লোকটিকে স্কুলের শিক্ষক-ছাত্র প্রায় সবাই ভক্তিশ্রদ্ধার চোখে দেখত, তা ছাড়া একটু ভয়ও করত। ভয়ের কারণ, স্বয়ং হেডমাস্টার মশাইও মৌলবী সাহেবকে সমীহ করে চলতেন। অনেক কাজেই তিনি মৌলবী সাহেবের পরামর্শ নিতেন।

কিন্তু মৌলবী সাহেব নিজে মনে মনে ভয় করতেন লেবুকে। ফোর্থ ক্লাসে ফারসি পড়াতে গিয়ে লেবুর নিত্যনতুন উৎপাতের জ্বালায় তিনি অস্থির থাকেন। তার ওপর আজ আবার পড়াতে হবে বাংলা। গোলমাল এড়ানোর জন্যে তিনি তাই ক্লাসে ঢুকেই এক বুদ্ধি আঁটলেন।

বললেন, 'আজকে ক্লাসে সংক্ষিপ্ত একটি রচনা লিখতে দিচ্ছি তোমাদের; মনে করো, পাঁচশো করে টাকা দিলাম তোমাদের সবাইকে। সেই টাকা দিয়ে কে কী করবে লিখে দেখাও। কোনোরকম গোলমাল করবে না, আগেই বলে রাখছি।'

খাতা পেন্সিল নিয়ে রচনা লেখায় মনোযোগ দিল সবাই। লেবু এককোণ থেকে উঠে বলল, 'পাঁচশো করে প্রতিজনকে দিলে সে যে অনেক টাকার ব্যাপার, স্যার। দু-পাঁচ হাজারেও কুলোবে না! এত টাকা দিয়ে ফেলবেন স্যার? কিছু কমিয়ে দিলেই তো ভালো।'

লেবুর এ অবান্তর উক্তিতে মৌলবী সাহেব মনে মনে রেগে গেলেন। বাইরে তা প্রকাশ না করে বললেন, 'যাকে বলে হোপ্‌লেস্ ছেলে, তুমি হয়েছ তাই। বললেই কি আর দেয়া হল? বললাম তো, মনে করে নাও পাঁচশো করে টাকা তোমরা পেলে।'

'ওহো, তাই বলুন, মনে করতে হবে পাঁচশো করে টাকা আপনি দিলেন, বেশ।' বলেই লেবু এক মিনিটে কী যেন লিখে খাতা উল্‌টে রাখল। মৌলবী সাহেবের তা দৃষ্টি এড়াল না।

ঘণ্টা বাজবার আগেই সবার রচনা লেখা শেষ হল। মৌলবী সাহেব খাতা দেখতে লাগলেন। কেউ লিখেছে, টাকা পেয়ে ব্যবসা করবে, কেউ দান করবে। কেউ কেউ লিখেছে, গাঁয়ে স্কুল করে দেবে, গরিব ছেলেমেয়েরা সেখানে বিনা-বেতনে পড়বে। কিন্তু লেবু লিখেছে চমৎকার। দু-চার কথায় রচনা তার শেষ। লিখেছে : কম টাকা হইলে বিশেষ চিন্তাভাবনা করিয়া খরচ করিতাম। পাঁচশত টাকা পাইলে নিশ্চিন্তে পায়ের ওপর পা তুলিয়া বসিয়া খাইব।

এবার আর মৌলবী সাহেব রাগ চেপে রাখতে পারলেন না। লেবুর কান টেনে দিয়ে বললেন, খাওয়াচ্ছি তোমাকে পায়ের উপর পা তুলে। এ সব কী লিখেছ, হোপ্‌লেস্ কাঁহাকা!—বলেই পিঠের ওপর দু-ঘা বসাতে যাবেন, এমন সময় দফ্‌তরি এল একটা নোটিশ নিয়ে। হেডমাস্টারের নোটিশ—টিফিনের ঘণ্টা শুরু হলে পাঁচ মিনিটের জন্য সবাইকে হাজির হতে হবে কমনরুমে।

লেবুকে রেহাই দিয়ে মৌলবী সাহেব ছেলেদের নোটিশের মর্ম বুঝিয়ে দিলেন।

টিফিনের ঘণ্টায় প্রায় সবাই এসে জড়ো হল কমনরুমে। হেডমাস্টারমশাই বলতে লাগলেন : চণ্ডীতলা ঘোষদের বাড়ির পাঠশালার বৃদ্ধ পণ্ডিতমশাই বামাপদবাবুকে তোমরা সবাই জানো আশা করি। তোমাদের অনেকেই তাঁর ছাত্র। তাঁর পাঠশালায় পড়ে এখানে এসেছ। কিন্তু বড়ই দুঃখের বিষয়, তিনি তোমাদের নামে আজ এক গুরুতর অভিযোগ করে পাঠিয়েছেন। তোমরা নাকি তাঁর ছাত্রদের অহেতুক ঠাট্টা-বিদ্রূপ করো। তার নমুনাও তিনি পাঠিয়েছেন। পাঠশালার দেয়ালে কে যেন ছাত্রদের নামে খড়ি দিয়ে লিখে রেখেছে :

বামা পণ্ডিতের পাঠশালা
বিদ্যে হয় না কাঁচকলা—
দু-হাতে দুই কলম দিয়ে
বসিয়ে রাখে গাছতলা।

অভিনব এ ছড়া শুনে ছাত্ররা সব মুচ্‌কি মুচ্‌কি হাসতে লাগল। হেডমাস্টার আবার বললেন, 'আমার দৃঢ় ধারণা, এ ছড়ার রচয়িতা তোমাদের ভেতরেই রয়েছে। কে সেই কবিবর তা স্বীকার করলে কিছুই আমি বলব না তাকে, শুধু ভবিষ্যতের জন্যে সাবধান করে দেব। তা না হলে বুঝতেই পারছ, অপরাধীকে বের করে কঠিন সাজার ব্যবস্থা করতেই হবে আমাকে।'

তিনি চুপ করলেন। সবাই মুখ চাওয়াচাওয়ি করতে লাগল। এমন সময় মাথা নিচু করে উঠে দাঁড়াল লেবু। বলল, 'এ অন্যায় কাজ আমিই করেছি স্যার, অন্যায় বলে তখন বুঝতে পারিনি।'

কার যে এ-কাজ হেডমাস্টারমশাই আগেই তার কিছুটা আঁচ করে রেখেছিলেন, অনুমানটা তাঁর সত্যিই হয়েছে দেখা গেল। এবার তিনি বললেন, 'অন্যায় করেছ এবং তা স্বীকার করবার সৎসাহস তোমার আছে দেখে এবার আমি কিছুই বললাম না। গুরুজনদের নিয়ে ঠাট্টা-বিদ্রূপ করা খুবই অন্যায় বুঝতেই পারছ। কাজেই বলে রাখছি, ভবিষ্যতে যেন এ-ধরনের অন্যায় তোমরা করেছ বলে শুনতে না পাই। আর হ্যাঁ, আরেকটা কাজ তোমাকে করতে হবে। কালকে স্কুলে আসবার পথে পণ্ডিতমশাইর কাছে ক্ষমা চেয়ে আসতে হবে তোমাকে। পারবে তো?'

'খুব পারব স্যার।'

'বেশ, থ্যাঙ্ক ইউ। তোমরা সবাই এবার টিফিনে যেতে পারো। টিফিনের পরে লেবু আমার সঙ্গে লাইব্রেরিতে দেখা করে যেও।' বলে তিনি চলে গেলেন।

একটু পরে লেবু এসে লাইব্রেরিতে ঢুকলে তিনি বললেন, 'কাল থেকে তুমি মৌলবী সাহেবের সঙ্গে স্কুলে আসবে—কখ্খনো একলা আসবে না, বলা রইল। এ-কথা বলার জন্যেই তোমাকে আসতে বলেছিলাম। আচ্ছা, এবার তুমি যেতে পারো।'

লেবু চলে গেল। এ নতুন ব্যবস্থাটা কিন্তু মৌলবী সাহেবের মোটেই মনমতো হল না। তিনি প্রকাশ্যেই বললেন, 'আমার ঘাড়ে আবার এই ইব্‌লিশটাকে চাপালেন ক্যান হেডমাস্টার মশাই?'

হেডমাস্টার মশাই হেসে বললেন, 'ইবলিশ বলুন আর যাই বলুন, ছেলেটা কিন্তু ইন্টেলিজেন্ট। এ-ধরনের ছেলেদের বলতে পারেন, 'অ্যাবাভ এ্যাভারেজ'—সাধারণের ব্যতিক্রম। সুযোগ পেলে, সুপথে চালিত হলে এরাই একদিন মানুষের মতো মানুষ হয়।'

এরপর মৌলবী সাহেব আর দ্বিরুক্তি করা সঙ্গত মনে করলেন না। মৌলবী সাহেব ভিন্ন-জেলার লোক। লেবুদের পাড়ায় কাজিবাড়িতে জায়গির থাকেন। এ-ব্যবস্থার পর থেকে লেবুকে রোজই মৌলবী সাহেবের সঙ্গে স্কুলে আসতে হয়—পথে কারো সঙ্গে দুষ্টুমি করার তেমন সুযোগ আর হয় না।

কিছুদিন পরে স্কুলে শুরু হয়েছে হাফ্-ইয়ার্লি পরীক্ষা। রুটিনমাফিক পরীক্ষার শেষের দিনে মৌলবী সাহেবের ওপর ভার পড়েছে ফোর্থ ক্লাসে গার্ড দেবার। সবাইকে বাদ দিয়ে লেবুর ওপর তাঁর সতর্ক দৃষ্টি। রাতদিন দুষ্টুমি আর বাঁদরামি করে ছেলেটা পরীক্ষায় কী করে ভালো নম্বর পায়, আজ সে-রহস্য তিনি ভেদ করবেন। নিয়মিত পড়াশুনা না করেও ভালো নম্বর পাবার সহজ পথ হল পরীক্ষার সময় নকল করা। লেবু যা ছেলে, তার পক্ষে কিছুই অসম্ভব নয়।

আড়চোখে কিছুক্ষণ লেবুর হাবভাব লক্ষ করে মৌলবী সাহেবের মনে হল অনুমানটা তাঁর যেন মিথ্যে নয়। লেবু কিছুক্ষণ পরপরই বুকপকেটে বাঁ-হাতের আঙুল দিয়ে ফাঁক করে কী যেন দেখে নিচ্ছে, তারপর আবার লেখায় মন দিচ্ছে।

ব্যাপারটা দু-একবার দেখেই মৌলবী সাহেব লেবুর কাছে এগিয়ে এসে হঠাৎ বললেন, 'দেখি তোমার জামার পকেটে কী আছে?'

লেবু আমতা আমতা করে বলল, 'ও কিছুই না স্যার।'

'কিছুই না কীরকম দেখি।' বলেই তিনি লেবুর বুকপকেটে হাত ঢুকিয়ে দিয়ে বের করলেন সিগারেটের একটা প্যাকেট। আর যায় কোথায়! মৌলবী সাহেব বলে উঠলেন, 'ছেলের এ বিদ্যেও হয়েছে দেখছি। সাধে কি আর হোপ্‌লেস্ বলি?'

বলেই তিনি সিগারেটের প্যাকেটটা যেমনি খুলেছেন অমনি একটা অদ্ভুত কাণ্ড ঘটে গেল। হঠাৎ তিনি তিড়িং করে লাফিয়ে উঠলেন।

ব্যাপারটা হল—সিগারেটের খালি-প্যাকেটটার ভেতর ছিল কয়েকটা আরশোলার বাচ্চা। স্কুল ছুটির পরেই পুকুরে ছিপ ফেলে মৎস্যশিকারের আয়োজন করেছে লেবু আগে থেকেই। আরশোলাগুলো হল বঁড়শির টোপ। হঠাৎ মুক্তি পাবার আশায় আনন্দে একটা আরশোলা গিয়ে আশ্রয় খুঁজতে লাগল মৌলবী সাহেবের গলার কাছে দাড়ির নিচে। সেটাকে কাবু করার আগেই দু-তিনটা ঢুকে পড়ল তাঁর পাঞ্জাবির ঢোলা আস্তিনের ভেতর। সটান্ ভেতরে গিয়ে উঠল। ভালো করে ব্যাপারটা বুঝবার আগেই ঊর্ধ্ববাহু মৌলবী সাহেব তিড়িং করে লাফিয়ে উঠলেন। বে-দিশা হয়ে লাফাতে লাফাতে তিনি পড়লেন গিয়ে পাশের একটি ছেলের ডেস্কের ওপর। ডেস্কের দোয়াত কলম সব উল্‌টে পড়ল গিয়ে ছেলেটার কোলে। কালি পড়ে জামা-কাপড়, পরীক্ষার খাতা সব একাকার হয়ে গেল। মৌলবী সাহেবের সেদিকে খেয়াল করার ফুরসত নেই। তিনি তখনো কেবলই লাফাচ্ছেন।

আসল ব্যাপার কিছুই বুঝতে না-পেরে অবাক ছেলেরা হাঁ করে চেয়ে আছে কলম তুলে। পাশের কামরা থেকে সতুবাবু তাড়াতাড়ি ছুটে এলেন তাই রক্ষা। জামার নিচে হাত গলিয়ে অতিকষ্টে তিনি আরশোলা ক'টা বের করলেন।

এতক্ষণ পরে নিষ্কৃতি পেয়ে মৌলবী সাহেব হাঁফ ছেড়ে বাঁচলেন। বললেন, 'হোপ্‌লেস্, সতুবাবু, একেবারেই হোপ্‌লেস্। পকেটে করে নিয়ে এসেছে কিনা তেলেপোকা। যতসব হোপ্‌লেস্ বে-আদব।'

সতুবাবু অতিকষ্টে হাসি চেপে বেরিয়ে গেলেন।

ছুটির পর লেবুর ডাক পড়ল হেডমাস্টার মশাইয়ের ঘরে। তার পেছনে পেছনে গেল আর সব ছেলেরা। কোনোরকম ভূমিকা না-করেই লেবুকে হেডমাস্টার জিজ্ঞেস করলেন, 'পকেটে করে ওগুলো এনেছিলে কেন?'

নিরুত্তর লেবু নতমুখে দাঁড়িয়ে রইল। তিনি আবার তাড়া দিয়ে উঠলেন, 'কিহে, কথার জবাব দিচ্ছ না যে?'

কিছুক্ষণ পর লেবু বলে উঠল, 'আমার তো কোনো দোষ নেই স্যার, উনিই তো ইচ্ছে করে আমার পকেট থেকে টেনে ওগুলো বের করলেন।'

'তা বুঝেছি, কিন্তু তুমি কেন ওগুলো পকেটে করে স্কুলে এনেছিলে?'

পুকুরে ছিপ ফেলবার কথাটা গোপন করে লেবু বলল, 'আরশোলা পুষব বলে ধরে এনেছিলাম স্যার।'

লেবুর কথা শুনে সবাই একযোগে হেসে উঠল।

হেডমাস্টার বললেন, 'দুনিয়ায় আর-কোনো জিনিশ পেলে না পুষতে, তাই আরশোলা পুষতে সাধ হয়েছে। তোমাকে আমি আরশোলা পোষাচ্ছি। ঘরের ঐ কোণে আরশোলা আছে। যাও, ওখানে দেয়ালমুখো দাঁড়িয়ে থাকো গে। আধঘণ্টা পরে তোমার ছুটি।'

মিনিট-পাঁচেক পরে মৌলবী সাহেব ছাতা হাতে বেরিয়ে যাচ্ছিলেন। তাই দেখে লেবুর মাথায় চট্ করে একটা বুদ্ধি এসে গেল। হেডমাস্টারকে সে বলল, 'স্যার, এখন রোজ স্কুলে আসবার সময় মৌলবী সাহেবের সঙ্গে আসি।'

'হ্যাঁ, তা তো আমার জানাই রয়েছে।'

'কিন্তু—কিন্তু যাবার সময়.....'

লেবু কী বলতে চাইছে হেডমাস্টার মশাই তা সহজেই বুঝে ফেললেন। অন্যদিকে মুখ ফিরিয়ে অতিকষ্টে হাসি চেপে তিনি বলে উঠলেন, 'বুঝেছি, বুঝেছি আর বলতে হবে না। স্কুলে আসবার সময় পাহারাধীনে এলে যাবার সময়ও সে-ব্যবস্থা হবে না কেন, এইতো বলতে চাইছ? যুক্তি-যে তোমার অকাট্য তা মানতেই হবে। যাও, কিন্তু পথে দুষ্টুমি কোরো না। আর তা ছাড়া মৌলবী সাহেবকে, যাঁকে সবাই আমরা মান্যগণ্য ব্যক্তি মনে করি, তাঁকে বিরক্ত করতে যেও না।'

'আচ্ছা স্যার'—হেডমাস্টারের কথায় সায় দিয়ে লেবু বেরিয়ে গেল। কিন্তু যেতে যেতে ভাবতে লাগল মানুষ নিজে যা মনে করে সবসময় তা ঘটে কি? অঘটন তো কারো ইচ্ছায় অনিচ্ছায় ঘটে না। আজকার ব্যাপারটা কি লেবুর ইচ্ছায় ঘটেছে? লেবু কি চেয়েছিল, মৌলবী সাহেব তাকে সন্দেহ করবেন আর পকেট থেকে আরশোলার বাক্সটা টেনে বের করবেন? অথবা তিনি কি মনে করেছিলেন, ওটা খুললেই এমন বিপদ ঘটবে?

লেবুদের বাড়ি থেকে স্কুলে যেতে একটা ছোট খাল পার হতে হয়। খাল পেরিয়েই কুমোরপাড়া। পাড়াটার গা ঘেঁষে চলে গেছে পায়েচলা সরু পথ। সময় বাঁচানোর জন্যে সোজা পথে যেতে হলে এটাই সে-পথ। মৌলবী সাহেবের সঙ্গে এ-পথেই সেদিন লেবু যাচ্ছিল স্কুলে। যেতে যেতে তার চোখে পড়ল একটা কাঠবিড়ালী। কাঠবিড়ালীটা মাটি থেকে খুঁটে খুঁটে কী যেন মুখে দিচ্ছিল। লেবুর জন্যে সুবর্ণ সুযোগ। মুহূর্তে সে স্থান-কাল-পাত্র ভুলে গেল। পকেট হাতড়ে দেখল, রবারের ছোট গুল্‌তিটা ঠিকই আছে, মাটির তৈরি গুলিও আছে দু-তিনটা। কাঠবিড়ালী শিকারের এমন সুযোগ হেলায় হারানো যায় না। মৌলবী সাহেবের দৃষ্টি এড়িয়ে একমুহূর্তে সে তার গুল্‌তিটার সদ্ব্যবহার করে ফেলল।

আমগাছটার ঠিক পাশেই স্তূপাকারে সাজানো রয়েছে কুমোরদের অনেকগুলো মেটে হাঁড়ি-পাতিল। বেচারা লেবুকে হতাশ করে দুষ্টু কাঠবিড়ালী তিড়িং করে লাফিয়ে উঠল গিয়ে আমগাছের ডগায়; এদিকে লেবুর লক্ষ্যভ্রষ্ট গুলিটা লাগল গিয়ে একটা হাঁড়ির গায়ে। গাছের নিচে সেই হাঁড়িটা যেই ভেঙেছে অমনি স্তূপের উপর থেকে গড়িয়ে পড়ল আরো পনেরো-বিশটা হাঁড়ি-পাতিল, সব ক'টাই ভেঙে চুরমার। পলকে প্রলয়কাণ্ড ঘটে গেল। আওয়াজ হল যেন একটা বোমা ফাটল এইমাত্র।

কিসে কী হল মৌলবী সাহেব কিছুই বুঝতে পারলেন না। পেছনে চেয়ে দেখলেন, লেবু ততক্ষণে হাওয়া। কুমোরবাড়ি থেকে চিৎকার করে ছুটে এল আধপাগলা গোছের একটা লোক। এসে সামনেই পেল মৌলবী সাহেবকে। হাঁড়ি ফাটার শব্দে হতভম্ব হয়ে তিনি দাঁড়িয়ে আছেন। লোকটা এসেই তাঁর লম্বা কোর্তার খুঁট টেনে ধরল। বলল, 'চাইয়া চাইয়া দেখবার লাগছেন কী? দাম না দিলে যাইতে দিমু না।'

মৌলবী সাহেব আরো হতভম্ব। তিনিও রেগেই বলে উঠলেন, 'কাপড় ছেড়ে কথা বলো বে-আদব কাঁহাকা। তোমার হাঁড়ি কি আমি ফাটিয়েছি যে দাম দেব?'

কিন্তু কার যুক্তি কে শোনে? আধপাগলা লোকটা নাছোড়বান্দা। বলে উঠল, 'একটা ছেইলারে লইয়া রোজ রোজ আপনে স্কুলে যায়েন না এহান দিয়া? হেই ছেইলাডার এই কাম। হেই তো পাছের থনে দৌড় মারছে, দেখছি সব।'

পেছনের একটা বাড়ির আড়াল থেকে উঁকি দিয়ে লেবু সব দেখছিল। একেই বলে, উদোর পিণ্ডি বুধোর ঘাড়ে। অবশেষে মৌলবী সাহেব অতগুলো হাঁড়ির দাম নগদ দিতে না-পেরে হাতের ছাতাটা বাঁধা রাখলেন। ছাতা বাঁধা রেখে স্কুলের পথ ধরলেন। বললেন, দুদিন পর মাইনে পেলে ছাতাটা ছাড়িয়ে নেবেন।

শীত গ্রীষ্ম বর্ষা—সকল ঋতুতে মৌলবী সাহেবের হাতে থাকত ঐ একটি ছাতা; কাঁধে হলদে সুতোর বুটাতোলা বড় একখানা রুমাল, প্রয়োজনের সময় যা ব্যবহৃত হত জায়নামাজ হিশেবে। বলতে গেলে এ-দুটি বস্তু ছিল তাঁর নিত্যসঙ্গী। আজই প্রথম দেখা গেল স্কুলের পথে মৌলবী সাহেবের কাঁধে রুমালখানা আছে কিন্তু হাতে ছাতাটি নেই।

এদিকে ভিন্নপথে এসে লেবু কিন্তু চুপচাপ বসে ছিল তার ক্লাসে। বসে বসে মুহূর্ত গুনছিল কোন্ সময় তার ডাক পড়বে হেডমাস্টারের কামরায়।

কিন্তু কী আশ্চর্য, ডাক পড়ল না। আরবি পড়াতে ক্লাসে এসে মৌলবী সাহেব নিজেও কিছু বললেন না। স্বাভাবিক কারণেই তাঁকে আজ বড় বিমর্ষ দেখাচ্ছিল।

লেবুর মনটা হঠাৎ ভরে গেল মৌলবী সাহেবের প্রতি সহানুভূতিতে। অনুতাপও কম হল না তার। বাড়ি গিয়েও সে মনে শান্তি পেল না।

পরের দিন।

স্কুলে যাবার সময় হয়েছে। লেবুর পা নড়ছে না আজ কাজিবাড়ি গিয়ে মৌলবী সাহেবের সামনে দাঁড়াতে। তবু এক-পা দু-পা করে নিতান্ত অপরাধীর মতো সে এগিয়ে গেল। অপরাধীর মতোই সে কাছারিঘরের বাইরে দাঁড়িয়ে রইল। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে শুনতে লাগল, বুড়ো কাজি সাহেবের সাথে কথা বলছেন মৌলবী সাহেব। বলছেন, 'মাস্টারি কাজ আর ভালো লাগছে না। এর চেয়ে গাঁয়ে গিয়ে চাষবাস করাও ভালো। কাল বাড়ির চিঠি পেলাম—ছেলেপিলেরা ভুগছে অসুখে-বিসুখে। তার ওপর আবার বিপদ দেখুন, বাপ-দাদার আমলের সামান্য একটু জোতজমি ছিল, তাও নিলামে উঠতে চলেছে বাকি-খাজনার দায়ে। এই চাকরি করে দূর থেকে কত দিক আর সামলাব।'

বলতে বলতে বাইরে এসে দেখলেন, লেবু দাঁড়িয়ে আছে বাইরে। তাকে বললেন, 'আজ আর স্কুলে যাব না লেবু। মনটা তেমন ভালো নেই। এই দরখাস্তটা দিও হেডমাস্টার মশাইকে।'

হঠাৎ লেবু বলে উঠল, 'আমাকে মাফ করুন স্যার। আমি আর দুষ্টুমি করব না।'

মৌলবী সাহেব লেবুকে কাছে টেনে নিয়ে বুকে জড়িয়ে ধরলেন, 'না লেবু, তুমি তো ইচ্ছা করে কোনো অন্যায় করোনি—সবই ঘটনাচক্রে ঘটে গেছে। তোমরা ভালো হবে, মানুষ হবে, এইতো আমাদের কামনা।'

লেবু যেন মৌলবী সাহেবের কাছ থেকে সেদিন এক নতুন দীক্ষা গ্রহণ করল।

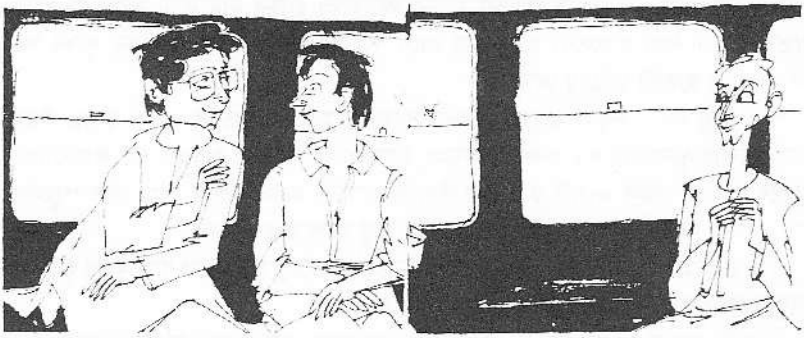

ফলাফল

শওকত ওসমান

উপদেশ আমি মোটেই সহ্য করতে পারি না। পয়সা খরচ হয় না তো উপদেশ দিতে। যিশুখ্রিস্ট শুধু উপদেশ দান করেননি, প্রাণও দান করেছিলেন। দানের সঙ্গে প্রাণের যোগ চাই, কিন্তু তেমন দৈবাৎ ঘটে। তাই ছেলেবেলা থেকেই মুরব্বিদের ওপর আমার ভারি রাগ। খালি উপদেশ আর উপদেশ। অমুক কর্, তমুক কর্। স্কুলে যা, জোরে হাঁটিস্‌নি, গাড়ি-ঘোড়া দেখে চল্, হাঁচি পড়লে কড়ে আঙুল নাকের ডগায় নিয়ে যা, সাপ দেখ্‌লে কুল্‌হু আল্লা পড়্। বাপ্‌স! উপদেশের ঠেলায় কান ঝালাপালা।

হ্যাঁ, ১৯৪৪ কি ৪৫ সাল। গত যুদ্ধের সময় একবার ত্রিপুরার দিকে সফরে চলেছি। সফর মানে ভবঘুরেপনা। সিঙারবিল পার হয়ে যাব চাউড়া নামে এক গ্রামে—আমার এক স্কুলজীবনের বন্ধুর বাড়ি। চাটগাঁ মেল ধরেছি ভোর-ভোর, শিয়ালদহ স্টেশনে বড় ভিড়। ইন্টার ক্লাসে গুড়ের কলসের মতো সব মানুষ বসে আছে। সকলের বুকেই হাঁটু। বেজায় ভিড়। ইন্টার ক্লাসে জায়গা নদারৎ।

প্রমোশন নিলাম, নিজেই নিজের হেডমাস্টার। ইংরেজিতে যাকে বলে self-promotion : আর এক ধাপ উঁচু—সেকেন্ড ক্লাসে চড়ে বসলাম। পোশাকে আমি আজ টেস্ ফিরিঙ্গি, সেকেন্ড ক্লাসের ইজ্জত রক্ষা হল কিনা ভাবছি।

গরমের দিন। পাৎলুন, হাফশার্ট, কাবুলি স্যান্ডেল—। আমার কামরায় আমি একমাত্র প্রাণী। তারপর এল কয়েকটা মশা। গুন্‌গুন্ করে করে তারাও চলে গেল। আমি একা। চুপচাপ থাকা আর ভালো লাগে না। সঙ্গীর খোঁজও সম্ভব নয়। আমি ভারি মজ্‌লিশি। মজ্‌লিশ ছাড়া মন খুঁৎখুঁৎ করে।

গ্রীষ্মের বেলা। তখন মাত্র আট্‌টা বাজল। রেললাইনের দুপাশে পল্লিজীবনের ছোটখাটো কত ছবি ভেসে যাচ্ছে। কিন্তু আমার চোখ তৃপ্তি পায় না। 'সঙ্গী চাই।' মন ফোঁসফোঁস করে। 'সঙ্গী চাই।' কিন্তু উঁচুক্লাসে প্রমোশন দিয়ে তো কাউকে আনা চলে না। মানিব্যাগে যাতায়াতের খরচ ছাড়া আরো গোটা-তিনেক টাকা আছে মাত্র। চঞ্চল হয়ে উঠলাম। 'সঙ্গী চাই।'

রাণাঘাটে এসে ট্রেন থাম্‌ল। নেমে পড়লাম। প্লাটফর্মে আরো যাত্রী নেমেছে—কেউ বাতাস, কেউ বাতাসা আর পানি খাওয়ার লোভে বা উদ্দেশ্যে। আমার লোভ কোনোদিকে নয়। শুধু একজন সঙ্গী চাই।

'সঙ্গী চাই।' মাথার ভেতর অস্বোয়াস্তি ঘুরছে। হঠাৎ কানে গেল : 'হা—বি—ব-।' চোখ কচলিয়ে দেখি, সত্যি সম্মুখে আমার স্কুলের বন্ধু মাসুদ। টিফিন-কেরিয়ারের খোলে পানি নিয়ে ফিরছে।

—আরে তুই!

—তুই!!!!!!

অতি অবাক দু-জোড়া চোখ।

বন্ধু হঠাৎ বলে, কোথায় যাবি?

—আখাউড়া।

—আখাউড়া! তারপর?

—সিঙারবিল। তারপর চাউড়া।

বন্ধু সিঙারবিলের জলরাশির উপর কবিত্ব করতে গেলেও আমি থামিয়ে দিলাম তাকে।

—তুই কোথায় যাবি?

—চাটগাঁ।

—বেশ। চল্ আগে একসঙ্গে আস্তানা বাঁধি, তারপর সব গল্প।

—বেশ চল্, আমার কামরায়।

—তুমি কোন্ কামরায় আছ?

—পাশে।

ইন্টার ক্লাসে বন্ধুর আস্তানা।

নিরাশ হয়ে পড়লাম। হেড্‌মাস্টার হলে বন্ধুকে প্রমোশন দিতে পারতাম। অন্তত হেড-গার্ড। কিন্তু দূর ছাই, আমি-যে কিছুই নই!

উপায় ঠিক করে ফেললাম। আমার কামরায় চাবি দিয়ে বন্ধুর পাশে এসে বসলাম। গার্ড রাজি হয়ে গেল।

বন্ধুর সিট্ থেকে এক গজ দূরে এক ভদ্রলোক বসে আছেন। পাতলা চেহারা। চোয়াল ভাঙা, মাটির দিকে বকের মতো চোখ রেখে কথা বলে। কথা তো নয়, ইঞ্জিনের হুশ হুশ গর্জন। মুখ তার ইঞ্জিনের মতো চলে। কথার কী তোড়! একমুহূর্ত কামাই নেই!

পোড়াদহের কাছে হঠাৎ কল বিগ্‌ড়ে চার ঘন্টা 'লেট' হয়ে গেল। কিন্তু ভদ্রলোকের মুখের কল বিগ্‌ড়ায়নি। দু-তিনটে স্টেশন পরে ইঞ্জিন আবার থামল পানি নিতে।

ভদ্রলোকের মুখ হঠাৎ থেমে গেছে! ব্যাপার কী? বকর বকর-এর জ্বালায় চোখ এতক্ষণ অন্যদিকে ফিরিয়েছিলাম। চেয়ে দেখি ভদ্রলোক হাঁ করে আধডজন পান পুরছেন মুখে। মুখ নয় ইঞ্জিন বটে; ইঞ্জিনের দরকার পানি, ওঁর পান। ইঞ্জিন চলল সঙ্গে সঙ্গে। বাগ্-ইঞ্জিন। কথা আর কথা।

ভদ্রলোক বল্‌ছেন : 'আরে মশাই, উপদেশ শোনে কে? এই ধরুন, ট্রেন থেকে নেমে স্টিমার ধরতে হবে—আগে গেলে ভালো জায়গা পাওয়া যায়! কিন্তু আজকালের ছেলেরা তা পারবে কেন? সব বাবু, একদম বাবু। বেড়াতে বেরুবে, সঙ্গে সুটকেস, হোল্ডঅল, ফ্লাস্ক, ট্রাঙ্ক—গোষ্ঠীর মালপত্র। সব ড্যামবাবু। ট্রেন গোয়ালন্দ এল। 'কুলি, কুলি'—ড্যামবাবুর চিৎকার শুনো। তারপর দামদস্তুর । শেষে কোলাব্যাঙের মতো থপ্‌থপ্ করে বাবুসাহেব পা ফেলে এগুবেন। যখন স্টিমার ঘাটে, তখন স্টিমার বোঝাই, শেষে গুড়ের কলসির মতো বুকে হাঁটু দিয়ে বসতে হবে। আর আমি? আমি তখন বিছানা পেতে দিব্যি শুয়ে আছি। থাকব না কেন? ঐ দেখুন বিছানা দড়ি দিয়ে বেঁধে নিয়েছি। ওজন পাঁচসের। সব আছে ওর ভেতর—ট্রেন থামলে বগল্‌দাবা করে মার দৌড়। একদম প্রথম স্টিমারে—আর আজকালকার ড্যাম ফুলবাবুর ছেলেরা—' ভদ্রলোক যেন আমার দিকে কটাক্ষ করলেন। অর্থাৎ ভাবটা : দেখুন না, সামনে একটা নজির খাড়া নয়, বসা আছে।

তারপর আরো উপদেশের বহর পদ্মার স্রোতের মতো চলল! শেষে মন্তব্য করলেন, '...আজকের ছেলেরা দূর-দূ-উ-র।'

যুদ্ধের জন্য ট্রেনে তখন বাতি জ্বলত না। সন্ধ্যা এলে সব অন্ধকার।

সন্ধ্যা অনেকক্ষণ নেমেছিল। অন্ধকারে ইঞ্জিন চলছে, আর সঙ্গে সঙ্গে ভদ্রলোকের ইঞ্জিন। বাবা, তার কলকব্জা। 'নেহি বিগড়াতা'। ওই কল সহজে বিগ্‌ড়ায় না।

আমি সন্তর্পণে অন্ধকারে উঠে দাঁড়ালাম।

বন্ধু বলে, 'কী হল?'

'বসে বসে পা ধরে গেছে। একটু কোমর সিধা করে নিই।'

ভদ্রলোকের মুখ ছুটছে : 'আজকালের ছেলেরা—' আমার তখন হাত চলছে। মোটা নারিকেল কাতা—দড়ি দিয়ে বাঁধা। ভদ্রলোকের বগলদাবায় লাগেজ। সামান্য টান দিতে একদিকের দড়ি খুলে গেল। কাঠের বাঙ্ক পাতলা-সরু তক্তা পাশে-পাশে সাজানো। মাঝখানে ফাঁক রয়েছে। আমি অন্ধকারে দড়ি হাত-তিনেক খুলে ফেললাম। তারপর বাঙ্কের তক্তার ফাঁক দিয়ে এপাশ-ওপাশ গলিয়ে, একদম চীনের গোলকধাঁধা করে দিলাম। একদম chinese

puzzle । চৈনিক ধাঁধা। না puzzle করতে আর-একটু বাকি ছিল। আমি দড়ির মুখ তক্তার ফাঁকের ভেতর একদিকে টেনে খুব জোরে গিঁঠ দিয়ে বেঁধে দিলাম।

ভদ্রলোকের উপদেশের কামাই নেই : 'শাদাসিধা জীবনযাত্রা Plain living ছেলেরা ভুলে গেছে। সব বাবু ড্যাম—Dam বাবু।'

ট্রেন গোয়ালন্দে এসে থামার সঙ্গে সঙ্গে লাফ দিয়ে প্লাটফর্মে নামলাম। পরে কামরা খুলে মাল কুলির মাথায় চাপিয়ে দিলাম।

কুলি এগোয় । এমন সময় বন্ধুর কামরার পাশে দাঁড়ানোর ভান করি।

হুড়মুড় শব্দে যাত্রী নামছে। ভেতরে ভদ্রলোক চিৎকার করছে : 'ও হুজুর,—দেশালাই-ম্যাচিস্ আছে আপনাদের কাছে? দেশালাই—দেশা—আমার বিছানা আটকে গেছে, আমার বিছানা, ও হুজুর, ও সাহেব, মশাই.....' রীতিমতো উর্ধ্বশ্বাসে চিৎকার।

জনান্তিকে একজন বললে, 'বিছানা আটকে গেছে? আপনার মাথা ঠিক আছে তো?'

'ও মশাই, ও হুজুর একবার দেশালাইটা জ্বালুন না, একটিবার দয়া করে, ও সাহেব—

ভেতরে হেঁচাহেঁচির কসরত চলছে। 'ও স্যার, দেশালাইটা আছে—ওরে কোন্ বেটা শালা—ও মশাই, ও ব্যাটা.... ।'

যাত্রীরা সকলে স্ব-স্ব ব্যস্ত। কে শোনে? কে জ্বালে দেশালাই?

'ও মশাই, কোন্ ব্যাটা—ও মশাই ... ও ... দেশালাই ... ।'

বন্ধু মাসুদ প্রায় হাসির চোটে ধুলায় গড়াগড়ি দেয় আর কী। না, আর দেরি করা চলে না। বন্ধুর ইন্টার ক্লাসে জায়গা পাতব। অনেক এগিয়ে গেছে, আমি তো কুলির সঙ্গে ছুট দিলাম।

স্টিমার ছাড়ে-ছাড়ে। প্রায় দেড়ঘন্টা পরে দেখলাম সেই ভদ্রলোকের আলুথালু বেশ। বিছানা কাঁধে; বগলে নয়। ইন্টার ক্লাসের দরজায় এসে দাঁড়াল। চোখ বসে গেছে।

এককোণে গুড়ের কলসির মতো বসে পড়লেন তিনি।

লাকসাম পর্যন্ত এলাম। রেলের ইঞ্জিন ঠিক চলছে। কিন্তু মহাশয়ের ইঞ্জিন! 'একদম বিগাড় গিয়া।'

মাসুদ বিছানা পেতে চাদর মুড়ি দিয়ে শুয়েছিল। সে হঠাৎ খিলখিল শব্দে হেসে উঠল।

'তোর হল কী? এই পাগল'—বলে আমিও চাদর মুড়ি দিয়ে হাসি চাপার কসরত করতে লাগলাম।

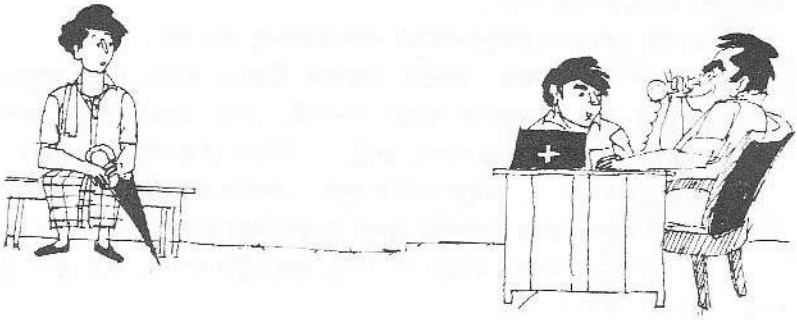

উল্টো শার্লক হোম্‌স্‌

সাজেদুল করিম

ডা. আফজাল। এম-বি-বি-এস্‌; এফ-আর-সি-এস্‌।

নামের শেষে আরও গুটিকয়েক ইংরেজি শব্দের আদ্যাক্ষর। জোর ঘোষণা করছে ভদ্রলোক বিলেত-ফেরত। অবশ্য, শুধু বিলেত-ফেরত হলে কথা ছিল না; ডা. আফজালকে নিয়ে রোগী-সমাজে নানারকমের কথাবার্তা : অদ্ভুত হাতযশ, বেজায় রসিক, অত্যাধুনিক চিকিৎসাপদ্ধতি। শুধু তাই নয়, তিনি নাকি দুর্জ্ঞেয় মনস্তত্ত্বেরও অধিকারী। রোগী দেখতে দেখতে ক্ষণে ক্ষণে রোগীর মনের কথাও বলে দিতে পারেন। রোগীরা চম্‌কে ওঠে।

প্রচলিত কথাটা আমাকেও ভীষণ ভাবিয়ে তুলল। ডা. আফজাল আমার খুব নিকট-সম্পর্কের আত্মীয়, অনেককালের চেনা। কী করে-যে এত পরিচিত মানুষটি এতখানি নাম কিনলেন, প্রথমত আমারও তেমন বিশ্বেস হয়নি।—পরে অবশ্য অন্য কথা। আচ্ছা, লোকের কথা বাদ, আপাতত নিজস্ব অভিজ্ঞতার কাহিনীটাই বলি না কেন, শুনুন।—

আমি গিয়েছিলেম জরুরি কোনো কাজে নয়—শুধু একখানা মেডিক্যাল সার্টিফিকেট জোগাড় করা। গিয়ে দেখি ভীষণ ভিড়। তিল ধারণের ঠাঁই নেই। ডা. আফজাল কিন্তু দূর থেকেই

দেখে : 'এই-যে, রফিক, এসো এসো—', বলে আমাকে ভেতরে ডেকে নিয়ে গেলেন। সামনে একখানা চেয়ার খালি । ওতেই বসে পড়লাম। একটু মুচকি হেসে ডাক্তার বললেন, 'তারপর? কী মনে করে—?' বললুম, 'নাহ্, ভাইজান, তেমন কিছু নয়। শুধু একটুখানি বি-সি-এস্...।' 'ওহ্ বুঝতে পেরেছি।—বসো। এখ্খুনি লিখে দিচ্ছি। হাতের কাজটা আগে সেরে নেই।' প্রথিতযশা চিকিৎসক! দেখুন-না, আমি শুধু বললেম, 'বি-সি-এস...।' আর সঙ্গে সঙ্গে আঁচ করে ফেললেন; বলে বসলেন, 'ছাড়পত্র লিখে দিচ্ছেন।' অথচ, কী-যে লিখবেন, কী-যে রোগ, বলতে গেলে আমাকে অনেক কথাই খুলে বলতে হয়।—

হয়েছে কী—চাকরি তো করি ব্যাংকে, কেরানিগিরি। ওতে সংসার চলে না। তাই সাধ জেগেছে, সামনের ডিসেম্বরে বি-সি-এস পরীক্ষাটা দেব, যাতে ভালো ফল করতে পারলে মোটা মাইনেয় 'অফিসার' হওয়া যায়। কিন্তু ভীষণ কঠিন পরীক্ষা, বিরাট প্রস্তুতির প্রয়োজন। অত সময় পাব কোথায়? ব্যাংকের অফিসারেরা-যে ছুটির কথা শুনতেই পারেন না।—একমাত্র অসুখবিসুখের ভান করা ছাড়া। তাই ডা. আফজালের শরণাপন্ন হওয়া।

ডাক্তার হেসে বললেন, 'এই! এ আর শক্ত কী? আমি লিখে দিচ্ছি তোমার Differential Calculus হয়েছে।'

'Differential Calculus?'—আমি আঁতকে উঠি, 'বলেন কী, ভাইজান! সে তো শুনেছি অঙ্কশাস্ত্রের একটা শাখার নাম!'

'হয়েছে...। রাখো। তোমার অফিসারদের যা মাথা : 'ডিফারেন্শিয়াল ক্যালকুলাস' যা 'সেরেব্রাল হেমোরেজ'-ও তা। আসল কথা, সার্টিফিকেটে দাঁত ফুটাতে না-পারলেই হল। বুঝেছ? তা অসুখবিসুখের নাম ছাড়া বুঝি এ তল্লাটে আসতে নেই?'

লজ্জিত হয়ে বললুম, 'না ভাইজান। সে-কথা নয়। ব্যাংকের কাজ, সময় পাইনে।' ডাক্তার আমার কথায় কান না দিয়ে খসখস করে সুপারিশপত্র লিখে চললেন।

ইতিমধ্যে একজন রোগীর প্রবেশ। বেঁটেখাটো ক্লিনশেভড্ মানুষটা। মুখমণ্ডলে ঘা। ডাক্তার ছোটখাটো প্রেসক্রিপশানে আবার তেমন গা করেন না। লেখাটা থেকে মুখ না-তুলেই কয়েকটা ট্যাবলেট্ আমার হাতে দিয়ে বললেন, 'রফিক, এগুলো পেশেন্টকে দিয়ে দাও। তারপর জেনে নাও, ও দিনে ক'বার করে শেভ্ করে?' লোকটার সঙ্গে সঙ্গে জবাব :

'প্রায় ত্রিশ-চল্লিশ বার—।'

'ত্রিশ-চল্লিশ বার—!!' আমার তো আক্কেল গুড়ুম! চল্লিশ বার শেভ্ করলে মানুষের কিছু থাকে কি—?

ডাক্তার হেসে বললেন, 'তাই তো বলি হে, রফিক, তোমাদের ব্যাংকারদের মাথায় ঘিলুর অভাব। আরে, বুঝতে পারছ না? পেশেন্ট পেশায় ক্ষৌরকার—ব্যাংকার নয়। দিনে লোকের দাড়ি শেভ্ করে বেড়ায় আর কী ত্রিশ-চল্লিশবার। জিজ্ঞেস করো, জানবে।'

ডাক্তারের কথায় এবার লোকটাসহ আমি হো হো করে হেসে উঠি। লোকটাও অম্লানবদনে স্বীকার গেল : হ্যাঁ, সত্যিই সে একজন সেলুনম্যান। মুখে ক্ষুরঘটিত ঘা হয়েছে।

ততক্ষণে মেডিক্যাল সার্টিফিকেট তৈরি হয়ে গেছে। ডাক্তার কাগজখানা আমার হাতে ছুড়ে দিয়ে বললেন, 'এই নাও তোমার 'পরীক্ষা'-রোগের নোস্খা। আচ্ছা যা যা দেখলে, তাতে তোমার কী মনে হয়? আমার চিকিৎসা সম্পর্কে তোমার কী ধারণা?'

খানিক ভেবে বললুম, 'তবে কি ভাইজান, বলতে চান, ডাক্তারির সাথে 'ডিটেকটিভি' মিশিয়ে আপনার চিকিৎসা এবং এই আপনার পদ্ধতি?'

'ছাই বুঝেছ!' বলে ডাক্তার কী যেন ফের ব্যাখ্যা করতে যাচ্ছিলেন।

বাধা দিয়ে বললুম, 'না, ভাইজান, উঠি। বড্ড বেলা হয়ে গেল। অফিসার আবার রাগ করবেন।'

মাথা নেড়ে ডাক্তার বললেন, 'যাবে কোথায়, শ্রীমান? বাইরে যে বৃষ্টি— !'

খানিকটে অবাক হলেম বৈকি! ডাক্তার তো চেয়ারেই ঠায় বসা! টেবিল থেকে একটুও মুখ তোলেননি, অনবরত লিখেই যাচ্ছিলেন। তবে কেমন করে জানলেন, বাইরে টিপটিপ বৃষ্টি?

এতক্ষণ পরে মনে মনে লোকটার প্রতি আমারও শ্রদ্ধার ভাব জাগ্রত হল : হ্যাঁ, লোকে-যে এঁকে অদ্ভুত ব্যক্তিত্বসম্পন্ন দুর্জ্ঞেয় শক্তির অধিকারী বিরাট মহাপুরুষ মনে করে, কথাটা দেখছি নেহাত ফেলে দেবার নয়। তারপর পাশ ফিরতেই দেখি, নতুন এক পেশেন্টের আবির্ভাব : হাতে ছাতা, পায়ে পাম্প-স্যু, পরনে চেক-লুঙ্গি।

ডাক্তার আগন্তুককে সামনের আসন দেখিয়ে বললেন, 'বসুন, ঐ চেয়ারটায়। আচ্ছা, রোগের কথা পরে। আপাতত বলুন তো, কদিন হল আপনার বার্মা থেকে ফেরা হয়েছে?'

লোকটা তো অবাক! 'আপনি জানলেন কী করে — ?' সত্যিই মাসখানেক হল সে রেঙ্গুন থেকে ফিরেছে। কিন্তু সে-কথায় কর্ণপাত না করে ডাক্তারের ফের আর একখানা প্রশ্ন : 'নিশ্চয়ই আপনি বিদ্যুৎঘটিত কারখানায় কাজ করেন?' লোকটা অবাকের ওপর অবাক! 'আচ্ছা, আপনার নাম মুন্সী করমউল্লাহ্। আপনার বাড়ি নোয়াখালী। সাং মাইজদি। নয় কি?' লোকটার অবাকের পরিসীমা নেই। আমিও হতভম্ব : 'এ যে দেখছি, ভাইজান, আপনি সাক্ষাৎ শার্লক হোম্‌স্।'

'আরে, থাম, বৎস,' —ডাক্তার বললেন চারিয়ে, 'সবে তো শুরু, সবুর করো। মজা আরো দেখার বাকি রয়েছে-যে?'

এমন সময় ভেতর থেকে ডাক এল : ভাবী নাস্তা তৈরি করে বসে আছেন। আমাকে ভেতরে যেতে হবে।

অগত্যা কী আর করি। লোকটিকে সেখানে সে-অবস্থায় বসিয়ে রেখে ডাক্তারসহ আমি ভেতরে চলে এলাম। [এখানে একটি কথা বলিনি বুঝি? ডাক্তার সপরিবারে থাকার বন্দোবস্তসহ বঙ্গবন্ধু এভন্যুতে চেম্বার নিয়েছেন]

চায়ের কাপে চুমুক দিতে দিতে এবার ভাইজানের ব্যাখ্যা : 'আচ্ছা, ভালো কথা, রফিক। নিশ্চয়ই তুমি মনে মনে বসে ভাবছ, অসাধারণ ব্যক্তিত্বসম্পন্ন তোমাদের এ মহাপুরুষ ভাইটি সেদিনকার ডা. আফজাল আজকে হয়ে বসেছেন বিরাট মনস্তত্ত্ববিশারদ, নয় কি?'

আমিও প্রায় সায় দিতেই যাচ্ছিলেম।

ডাক্তার হো হো করে হেসে উঠলেন।

'ও কী, হাসছেন কেন?'

'হাসব না? তুমি একটা আস্ত গবেট। আরে, বাপু, ডাক্তারেরা আবার মহাপুরুষ হলেন কবে থেকে? সবাই তো ওই রুপোর টাকা—ঝন ঝন ঝনাৎ 'রূপচাঁদের'—শিকারি বকের যেমন তপস্যা পুঁটিমাছের।'

হেঁয়ালিটা আমি তবু বুঝে উঠতে পারিনে।

আমার অসুবিধে দেখে ডাক্তার এবার ফের নিজেকে নিজেই ব্যাখ্যা করা শুরু করে দিলেন : 'আচ্ছা, গোটাদুই উদাহরণ দিয়েই বলি। প্রথমত ঐ-যে লোকটাকে চেম্বারে বসিয়ে রেখে এলাম, ওর কথাই ভাবো না কেন? লোকটার কোমরে জড়ানো লুঙ্গির ওপর চওড়া করে পরা বেল্ট নিশ্চয়ই লক্ষ করেছ?'

'হ্যাঁ, তা তো দেখেছি।'

'কিন্তু ওরকম করে লুঙ্গি পরে কারা জানো?'

'না তো।'

'একমাত্র বার্মা মুলুকের লোকেরাই। অথচ, লোকটা চেহারায় বার্মিজ নয়, বাঙালি। এ থেকে অনুমান করা কি খুব কঠিন, লোকটা হালে বার্মা থেকে ফিরেছে? তারপর সে-যে বিদ্যুৎঘটিত কারখানায় কাজ করে, সে তো আরো সহজ।'

'কেমন করে?'

'ওর জুতোজোড়াই সাক্ষী। ওর পায়ে রয়েছে রবারের পাম্পস্যু। আর সবাই জানে, ইলেকট্রিক মিস্ত্রিরাই বিদ্যুৎ-এর 'শক' এড়াতে গিয়ে রবার-স্যু পরে কাজ করে থাকে। ফের, তৃতীয় বুদ্ধিটা—যেটা একসাথে তোমাদের উভয়কেই চমকে দিয়েছিল, সে তো আসলে সবচেয়ে সহজ। ওর ছাতাটাই প্রমাণ। তুমি খেয়াল করোনি, কিন্তু আমি লক্ষ করেছি, ওর ছাতার গায়ে বড় বড় শাদা হরফে লেখা : মুন্সী করমউল্লাহ্ মিস্ত্রী। সাং মাইজদি। জিং নোয়াখালী। ফের, ও যখন ছাতা বন্ধ করে চেম্বারের প্রবেশপথে এসে দাঁড়াল, দেখলাম ছাতাটা থেকে টপ্‌টপ্ করে পানি ঝরছে। এ থেকে আন্দাজ করা কি খুবই শক্ত যে, বাইরে বৃষ্টি হচ্ছে? সুতরাং দেখলে তো, ডিটেকটিভি বুদ্ধিটুদ্ধি কিছু নয়—স্রেফ্ কমনসেন্স। পার্থক্য শুধু, একদল লোক চোখ মেলে দেখেন আর একদল দেখেন না। আর যাঁরা দেখেন তাঁদের পকেটে রুপচাঁদার ঝাঁক আপনিই এসে ধরা দেবে, এ আর বিচিত্র কী? আর দেখ, খেলাটা জমে ভালো যদি এর সাথে 'টেলিফোন' এসে যোগ দেয়,—ঘরে একখানা টেলিফোন থাকে।'

'টেলিফোন?'

কথাটা ফের আমাকে বিভ্রান্ত করে তুলল।

'জি হ্যাঁ,—'টেলিফোন' । টেলিফোন-ই লাখ টাকা—বিংশ শতাব্দীর সোনার কাঠি রুপার কাঠি! সৌভাগ্যের রাজকন্যের ঘুম-ভাঙাতে টেলিফোনই যথেষ্ট। উহ্, বিশ্বেস হচ্ছে না বুঝি? এসো তাহলে আমার সাথে, আমি এক্ষুনি সপ্রমাণ করে ছাড়ছি।' বলেই ডাক্তার আমাকে হিড় হিড় করে টেনে নিয়ে চললেন।

ভাইজানের চোটপাট দেখে ভাবী আর স্থির থাকতে পারেন না : 'ইশ, হয়েছে। খুব তো জাঁক দেখাচ্ছ? কিন্তু বলি, ফোনখানা যে সকাল থেকে ডিস্‌কানেক্ট্ হয়ে পড়ে আছে, সে খবর রাখো কি?'

মেয়েমানুষের কথায় ডাক্তার বড় একটা কান দেন না : 'স্টাইল! বুঝেছ হে, রফিক,—স্টাইল!! স্টাইল-ই হচ্ছে হাল দুনিয়ার জীয়ন কাঠি, মরণ কাঠি। স্টাইল জানা থাকলে মরা-ফোনও যে মরা-হাতির দামে বিকোয়। আর না-জানা থাকলে এক পয়সারও দাম নেই,' —বলেই ডাক্তার ফের আমাকে টেনে নিয়ে চললেন।

চেম্বারে ফিরে এসে দেখি লোকটা যেই-কে-সেই ঠায় বসে আছে। ডাক্তার সেদিকে কিন্তু ভ্রূক্ষেপ না করে সোজা 'রিসিভার'-টা হাতে তুলে নিলেন; তারপর 'ডায়ালিং' করে চললেন। ডাক্তারের 'ডায়ালিং' দেখে আমার হাসি পায় : আমি তো জানি ফোনটা ডিস্‌কানেক্ট। কিন্তু ততক্ষণে ভাইয়ার মনস্তত্ত্ব আমার পুরোদমে রপ্ত হয়ে গেছে : হোক-না যন্ত্রটা খারাপ, মূর্খ রোগীকে ঘাবড়ে দিতে ও-ই যথেষ্ট। হতভম্ব পেশেন্ট অবাক-চোখে দেখুক : কী সব হোমরা-চোমরা তাঁর কনেক্‌শনস্‌? আর কত বিশাল তাঁর পসার-প্রতিপত্তি? সুতরাং ডাক্তার ফোন করে চললেন :

'থ্রি-ওয়ান-ফাইভ-সিক্স-টু-ফোর। হ্যালো! কে বল্‌ছেন? ও ড. ব্যানার্জি —? গুডমর্নিং, কেমন আছেন? তারপর কী খবর?.. এ্যা? কী বললেন —অক্কা পেয়েছে? তা পাবেই তো, নরেশ ডাক্তারের পাল্লায় যখন পড়েছে। কত বললাম, আমার এখানে রেখে যান। তা রাখবেন কেন? অথচ, সঙ্গেরটি দেখুন আমারই ক্লিনিকে দিব্যি হেসেখেলে বেড়াচ্ছে।...ও, হ্যেঁ হ্যেঁ, ঠিক ধরেছেন। ওঁরা তো বল্‌ছেন—সাবকন্টিনেন্টে এ-ই প্রথম। তবে 'বান্দা' যখন আপনাদের খেদমতে বেঁচে আছি, 'অপারেশন' কাকে বলে আরো দেখবেন। নো, থ্যাঙ্কস্‌।.... আমার মাথা খান। আমার কী ভাই, অত ঝামেলার সময় আছে? সেক্রেটারি, ভাইস-প্রেসিডেন্ট, ডিরেক্টর?... না, না,— অপেক্ষাকৃত ইয়ংম্যান অন্য কাউকে দিয়ে দিন।....আচ্ছা, আচ্ছা, সে দেখা যাবে খন।'

এতক্ষণে ডাক্তার ফোনটা রাখলেন।

তারপর রহস্যমাখা দৃষ্টিতে অপেক্ষমাণ রোগীটির দিকে একবার মাত্র দৃকপাত করলেন। জাদুমন্ত্রের মতো কাজ হয়েছে। গ্র্যান্ড সাকসেস্‌! সম্মোহিত রোগী ফোন-মাহাত্ম্যে আরো অভিভূত হয়ে পড়ল। উহ, খুদে একখানি যন্ত্রের ঠিক-যে এতখানি প্রতাপ, এত উত্তাপ, আমি কিন্তু ইতিপূর্বে কখনো প্রত্যক্ষ করিনি।

যাক, উদ্দেশ্য যখন সিদ্ধ হয়েছে ডাক্তার আফজাল এবার ধীরে ধীরে তাঁর জাল পাতলেন। বিনয়নম্র দৃষ্টিতে ভাঙাগলায় উচ্চারণ করলেন, 'ওয়েল মিস্টার, হোয়াট্‌ ক্যান আই ড্যু ফর য়্যু? বলুন, আপনার আমি কী খেদমত করতে পারি? জানেন তো, আমার ভিজিট : চৌষট্টি টাকা।'

ফিসের অঙ্ক শুনে লোকটা ঘাবড়ে গেল।

'না হুজুর আমি একজন গরিব—'

'গরিব। আচ্ছা, গরিবের জন্যে কন্‌সেশন রয়েছে—ষোলো টাকা। হল তো?'

'না হুজুর, আমি একটি অফিসের চাকুরে—।'

'ও বুঝেছি।—ছুটির দরখাস্ত?বেশ, তবে তো আরো হস্তা। মাত্র সাড়ে-চার টাকা। টাকাটা ফেলুন, আমি এখুনি সুপারিশপত্র লিখে দিচ্ছি।' বলেই ডাক্তার কাগজ কলম নিয়ে প্রস্তুত হলেন।

কিন্তু হঠাৎ ডাক্তারের সমস্ত ক্যাল্‌কুলেশন ভেস্তে দিয়ে লোকটির সবিনয় নিবেদন :

'হুজুর, রোগ আমার নয়।'

'ও খোদা, তাই নাকি? রোগিণী বুঝি বাড়িতে? তবে তো মস্তবড় ভুল হয়ে গেল।'

'না স্যার। তাও নয়। রোগ আপনার টেলিফোনের। আপনার স্ত্রী ভিন্ন-বাসা থেকে একটু আগে ফোন করেছেন। তাই আমি এসেছি ছেঁড়া-তারে জোড়া লাগাতে। আমি রোগী নই, স্যার—টেলিফোন কোম্পানির মেকানিক।'

গুণের আদর

গোলাম রহমান

নতুন চাকরটাকে নিয়ে ভারি মুশকিলে পড়া গেছে! হরদম এটা-সেটা ভুল করে বসছে। তার জন্যে বকুনিও খাচ্ছে খুব। কিন্তু উপায় নেই—এই ক'দিনের মধ্যেই ব্যাটা আব্বার সুনজরে পড়ে গেছে। ওর ওপর আব্বার কেমন যেন একটা মায়া লক্ষ করছি। ওর হাবাগোবা ভাব আর গরুর মতো নিরীহ চোখদুটোর দিকে তাকালে আমার নিজেরও খুব মায়া হয়। নেহাতই গো-বেচারা! দোষের মধ্যে কেবল কানে একটু খাটো। সেজন্যেই তার ওপর আমার রাগ।

পয়লা দিন ছোটচাচা এলেন। উনি শুকুরকে দেখতে পেয়ে আম্মাকে জিজ্ঞেস করলেন : ও, এই ছোঁড়াটাকে বুঝি নতুন চাকর রেখেছ ভাবী?

আম্মা বললেন : হ্যাঁ, সপ্তাহদুয়েক থেকে ও এখানে কাজে লেগেছে। মুনিম সাহেব ওকে পাঠিয়েছেন। ওর ভাই না কে যেন ওদের বাড়িতে কাজ করে।

: বেশ তো ভালো কথা। তাতে কোনো ক্ষতি নেই। তবে কথা হচ্ছে, সাবধান থাকা ভালো। কথায় বলে, 'সাবধানের মার নেই।'

ছোটচাচা বললেন : ওর নামটা এক্ষুনি রেজিস্ট্রি করিয়ে আনো থানা থেকে। দিনকাল ভালো না। কাউকে বিশ্বাস নেই।

আম্মা আবার অত ইংরেজি কথার মানে-মতলব বোঝেন না। বললেন : তাই-ই করাব। তবে এত তাড়াতাড়ি কী? একটু পুরোনো-টুরোনো হোক—বছরখানেক কামকাজ করুক তখন দেখা যাবে।

ছোটচাচা বললেন : সে কী ভাবী! পুরোনো হলেই তো ল্যাঠা চুকে গেল। তার জন্যে আবার রেজিস্ট্রি কিসের?

আম্মা আর সে-কথায় কান দিলেন না। জোরে জোরে ডাক দিলেন : শুকুর —ও শুকুর—

শুকুর সামনে এসে দাঁড়াল। তার পরনে লুঙি আর কোমরে গামছা বাঁধা। আম্মা বললেন : বাইরে দোকান থেকে ভালো জর্দা নিয়ে আয় এক ভরি—এই পাঁচ টাকার নোট ভাঙিয়ে।

ছোটচাচা ভয়ানক পান চিবোন। তাঁর আবার ভালো জর্দা না হলে চলে না।

আম্মার হাত থেকে টাকাটা নিয়ে শুকুর বেরিয়ে গেল।

তারপর পাঁচ মিনিট, দশ মিনিট করে সময় বয়ে যাচ্ছে। কিন্তু শুকুরের কোনো পাত্তাই নেই। কোথায় গেল হতভাগা? রাস্তায় কোনো দুর্ঘটনা বাধিয়ে বসেনি তো! আমরা সকলেই ভাবনায় পড়লাম। আর তাছাড়া জর্দার দোকান তো কাছেই। এতক্ষণ ও কী করছে? এইসব সাত-পাঁচ ভাবছি, এমন সময় পাঁচ গজ পর্দার কাপড় কিনে হাজির হল শ্রীমান শুকুর।

: ওরে হতভাগা জর্দা কোথায়? তোকে পর্দার কাপড় আনতে কে বললে? উল্লুক, গাধা কোথাকার!—ছোটচাচা রেগে জিজ্ঞেস করেন।

শুকুর আম্মার দিকে তাকিয়ে বললে : আপনিই তো বললেন, আম্মা।—অপরাধীর মতো তার কণ্ঠস্বর।

: হতভাগা, আমি তোকে পাঁচটাকার নোট ভাঙিয়ে জর্দা আনতে বলেছি, না পাঁচ গজ পর্দার কাপড় আনতে বলেছি? বেআক্কেল কোথাকার!

আমি বললাম : যাক, যখন এনেই ফেলেছে তখন ওই কাপড়টা রেখে দাও—পরে কাজে লাগবে।

তারপর শুকুরকে আবার খুচরো পয়সা দিয়ে বাইরে পাঠানো হল। সে জর্দা নিয়ে এল।

এই ঘটনার কিছুদিন পর। রান্নাঘরে কী করতে গিয়ে হঠাৎ পায়ের ওপর গরম চায়ের কেটলি উল্টে ফেলেছে ডলি। ভাগ্যিস পানি খুব ফুটন্ত ছিল না। তবুও পা-টা বেশ পুড়ে গেছে। আম্মা তাড়াতাড়ি বলে উঠলেন : যা তো বাবা শুকুর, চট্ করে ওষুধের দোকান থেকে মলম নিয়ে আয়। তোর ডলি বু' র পা পুড়ে গেছে।

হুকুম করলে সেটা আর তামিল করতে মোটেই ভুল হয় না। শুকুর তাড়াতাড়ি গিয়ে পশুদের দোকান থেকে ভালো দেখে একটা কলম কিনে নিয়ে এল। আম্মা তো হতভম্ব।

: হতভাগা, লোকের জান নিয়ে এদিকে টানাটানি—আর তুই কোন্ আক্কেলে পশুপতির দোকান থেকে কলম নিয়ে এলি? ফাজলামি পেয়েছিস?

—আমি ছুটে এসে বলি : আম্মা, বাড়ি থেকে কালা চাকরটাকে যত শিগগির পারো সরাও। তা না হলে আর চলছে না।

তারপর ওর হাত থেকে পয়সা কেড়ে নিয়ে আমি সামনের ডিসপেনসারি থেকে পোড়ার মলম নিয়ে আসি।

এই ধরনের ঘটনা হরহামেশা ঘটছে আমাদের বাড়ি।

একদিনের ঘটনা। বৃষ্টির অবশ্য কোনো নাম-গন্ধ ছিল না। কেননা, এটা বৈশাখ মাস। খর রোদ, সূর্যের তেজ খুব। হঠাৎ এরই মধ্যে কোথা থেকে কী করে আকাশ কালো মেঘে ছেয়ে গেল। সঙ্গে সঙ্গে শুরু হল হাওয়া আর বৃষ্টি। এই বৃষ্টি আর সেই বৃষ্টি! বন-বন শোঁ-শোঁ কত রকমের আওয়াজ বাতাসের সাথে! তার সাথে আবার কড়-কড়-কড়াৎ মড়-মড়-মড়াৎ বিদ্যুতের গর্জন।

একটু আগেই উয়ারি থেকে খালা-আম্মা এসেছেন আমাদের বাড়ি। সঙ্গে এসেছে সুলতান, ফরিদ আর ফওজিয়া।

আমরা কয় ভাইবোন মিলে আম্মার কাছে আবদার করলাম : এই বৃষ্টির দিনে গরম গরম পাঁপর ভাজা খেতে খুব মন চাইছে।

আম্মা বললেন : পাঁপর তো নেই ঘরে। তবে তা না করে চাল-ভাজা, মটর-ভাজা আর পেঁয়াজ-কুঁচি তেল দিয়ে মাখিয়ে দেই—খা। খুব ভালো লাগবে খেতে।

খালাত ভাই সুলতান বললে : পাঁপর আবার কী! এই সময় খিচুড়ি খেলে মন্দ হত না। —এই কথায় ফওজিয়া, ডলি, ফরিদ আর আমি আপত্তি জানালাম। আমরা কয়জন মিলে জিদ ধরলাম : না, পাঁপরই খাব।

অগত্যা আম্মা শুকুরকে ডাক দিয়ে বললেন : ছাতা মাথায় দিয়ে বাজার থেকে ভালো তেল আর কাঁচা পাঁপর নিয়ে আয়। দেখ্, কোনোরকম ভুলচুক যেন না হয়।

—শুকুরকে ভালো করে বুঝিয়ে দেয়া হল। শুকুর বললে : না, ভুলচুক কেন হবে আম্মা। যা বলবেন তা-ই আনব।

এই বলে সে খুব দ্রুত বাড়ি থেকে বের হয়ে পড়ল। আমরা তার কর্মতৎপরতা দেখে খুবই আনন্দিত হলাম। কিন্তু পরক্ষণেই আমাদের আনন্দগুলি কর্পূরের মতো উবে গেল। আমরা সকলেই দেখলাম যে, শুকুর একটা রঙিন ছিটের কাপড়ে বেঁধে গোটাদশেক বেল নিয়ে এসেছে। তার কাণ্ড দেখে খালা-আম্মা ততক্ষণে হাসতে আরম্ভ করেছেন।

আম্মা জিজ্ঞেস করলেন : কই রে গাধা তেল কই, আর পাঁপরই বা কোথায়?

ছিটের রঙিন টুকরো আর বেল কয়টার দিকে আঙুল উঁচিয়ে দেখালে শুকুর : এই যে!

আমি রেগে বলে উঠলাম : এই ঝড় বৃষ্টি আর ঠাণ্ডা আবহাওয়ার মধ্যে বরফ দিয়ে বেলের শরবত করে দাও—খেয়ে সকলে নিউমোনিয়া বাধাই।

আম্মা ঝাঁজালো কণ্ঠে বললেন : আল্লার নাম নে, হতভাগা। ওসব কী কুকথা মুখে আনছিস? আর এই হতভাগা চাকরটাই হয়েছে আমার যতসব অশান্তির কারণ। এই হারামজাদার জন্যেই ছেলেপিলেরা যতসব বাজে আর কুকথা মুখে আনছে!

তারপর উনি বললেন : হতভাগা কালা বদ্ধ কোথাকার! সাহেব বাড়িতে আসলে তোকে ঝাঁটা মেরে কালই বের করে দেব।

বৃষ্টিবাদল থেমে গেল। বিকেলবেলা আব্বা এলেন। রাতে খাওয়ার টেবিলে আম্মা শুকুর সম্বন্ধে কথা তুললেন। বললেন, ওই কালাটাকে নিয়ে আর পারা যাচ্ছে না! একটা বললে অন্যটা করে।

: অন্য একটা ভালো চাকর রাখো।—আব্বা-আম্মার কথায় সায় দিয়ে আমি বললাম।

এই কথা শুনে আব্বা ভয়ানক রেগে গেলেন। বললেন : ওকে কি আমি সাধে রেখেছি? ওর গুণের জন্যেই রেখেছি। সেটা তো আর তোমাদের মগজে ঢুকবে না। মুনিম সাহেব নিজে ওকে পাঠিয়েছেন।

আম্মা আর কিছু বললেন না। চুপ করে রইলেন। একটু পরে আব্বা বললেন : তোরা তো দেখতে পাস না। কালই তোদেরকে চোখে খোঁজা দিয়ে দেখাব। কই, তোর সিলভার ক্যাপ পার্কারটা কই?

আমি তাড়াতাড়ি এনে সেটা আব্বার হাতে দেই।

: আমাকে আর দিতে হবে না।—আব্বা রেগে বলে ওঠেন : ওটাকে আজ রাতে কল-ঘরের দরজার কাছে ফেলে আসবি। সকালে শুকুর থালা-বাসন মাজতে যাবে। ওরই ভাগ্যে জুটবে কলমখানা।

আম্মা বললেন : তা জেনেশুনে দামি কলমটা ওকে দিতে হবে?

আব্বা একটু নরম হয়ে বললেন : দিলেই বা।

যাই হোক, সেদিনকার মতো খাওয়াদাওয়া সেরে খালা-আম্মারা চলে গেলেন। আমরাও দক্ষিণহস্তের কার্য সমাধা করে সময়মতো ঘুমুতে গেলাম।

পরদিন সকালে উঠতেই দেখি আমার ফাউন্টেন পেনটা হাতে নিয়ে শুকুর হাজির : মিয়াভাই, আপনার কলমডা যে কহন পইড়া গ্যাছে—খেয়াল রাহেন নাই। অত বেখেয়াল অইলে চলব ক্যামনে?

আব্বা একটু দূরে দাঁড়িয়েছিলেন। তিনি বলে উঠলেন : দেখলি। সাধে কি আর ওকে রেখেছি। এর আগেও একদিন মানিব্যাগ ফেলে পরীক্ষা করেছি—তারপর একদিন একশো টাকার নোট ফেলে পরীক্ষা করেছি। কাজেই এ-কথা আমি জোর করেই বলতে পারি—আর যাই হোক, ছেলেটি চোর নয়। তার প্রমাণও পেয়েছি। আর মুনিম সাহেবও তাই বলেছেন। —আব্বা বলতে থাকেন : তবে কথা হল যে, কানে সে একটু কালা। বেশ তো, তার জন্যে কী? ও হালেই কালা হয়েছে। চিকিৎসা করালে সেরে যাবে। ইতিমধ্যে আমি ওর কান পরীক্ষা করিয়েছি। মাহব ডাক্তার বলেছেন, চিন্তার কারণ নেই—ভালো হয়ে যাবে।

আব্বা ওকে ডাকলেন! ডেকে পাঁচটা টাকা দিলেন। বললেন : এটা তোর বখশিশ। আর তুই সামনের দোকান থেকে আটা নিয়ে আয়। রুটির নাশ্‌তা খেয়ে তাড়াতাড়ি বেরুব। জরুরি কাজ আছে।

শুকুর সঙ্গে সঙ্গে বেরিয়ে গিয়ে একটা দুধ-আনা কেটলিতে কী যেন নিয়ে এল।

আমি জিজ্ঞেস করলাম : কী আনলি রে হতভাগা?

শুকুর হেসে বললে : কেন, মাঠা!

আব্বা শুনে হেসে উঠলেন : বেশ, বেশ। তারপর আম্মাকে বললেন : নুন দিয়ে মাঠাকে তৈরি করে দাও। রুটি খাওয়ার দরকার নেই। মাঠা খেলে পেট ঠাণ্ডা হবে।

শুকুর দু-পাটি দাঁত বের করে হেসে ঢুকে পড়ল রান্নাঘরে।

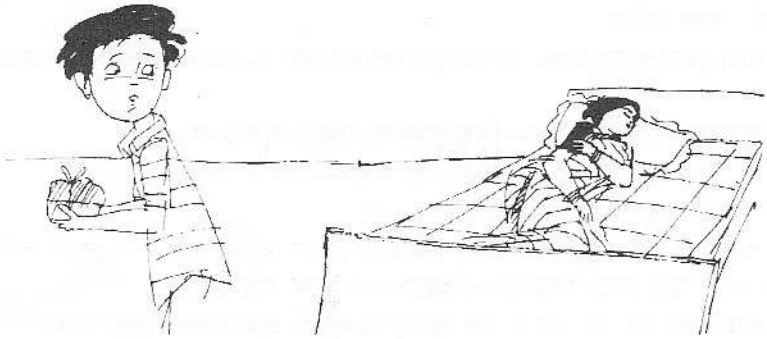

ঘুম তাড়ানোর গল্প

হাবীবুর রহমান

কী যে মুশকিল !

সন্ধেবেলায় পড়ার টেবিলে বই খুলে বসলেই ঘুমে জড়িয়ে আসে চোখদুটি। ঢুলতে ঢুলতে কখন–যে একেবারেই ঢলে পড়ে বইয়ের ওপর, টের করতেও পারে না বাবলু।

তারপর এক–একটা ঘণ্টা যেন এক–একটা মিনিট ! তরতর করে ঘড়ির কাঁটা ঘুরে চলে ছয় থেকে নয়ে। আপার চুলটানা কিংবা আম্মার বকুনির ধাক্কা খেয়ে কোনোমতে মাথাটাকে টেনে তোলে বাবলু বইয়ের ওপর থেকে—দুই হাত দিয়ে কচলাতে থাকে চোখ। কাঁদো–কাঁদো স্বরে জবাব দেয়, আমি ঘুমিয়েছি নাকি !

কিন্তু 'ঘুমিয়েছি নাকি' বলে এড়িয়ে যাওয়া কি এতই সহজ ! পরের দিন স্কুলে পড়া–না–পারার দরুন রীতিমতো বাইশবার কান ধরে উঠ–বস করে তবে রেহাই পাওয়া যায়।

দিনের পর দিন এ–যন্ত্রণা আর সহ্য হয় না বাবলুর—ঘুম তাড়ানোর একটা মোক্ষম কোনো ব্যবস্থা করতে হবেই ওকে !

শেষপর্যন্ত ও গিয়ে ধরনা দিয়ে পড়ল লাভলুর কাছে। লাভলু ওর সহপাঠী বন্ধু—পড়াশুনোয় একেবারে ইস্পাত—এত ধার যে গায়ে হাত দেওয়া যায় না। প্রশ্ন করার আগেই জবাব দিয়ে বসে থাকে।

সেই লাভলুকে ও ধরে বসল, 'ভাই লাভলু বাঁচাও আমাকে। এ লাঞ্ছনা আর সইতে পারি না!'

লাঞ্ছনা! তা লাঞ্ছনা বৈকি! বাবলুর কান ধরে উঠ-বস করার সেই দৃশ্যটা হুবহু ভেসে উঠল লাভলুর চোখে। উঠ-বস করতে করতে বেচারার মুখচোখ একেবারে জবাফুলের মতো লাল টকটকে হয়ে ওঠে! কানদুটো কালো হয়ে ওঠে কচলানো লেবুর মতো! আহা বেচারা!

মাথা চুলকে লাভলু বলল, 'তা পড়াশুনো করলেই তো হয়—অমন লাঞ্ছনা আর পোয়াতে হয় না!'

'পড়াশুনো করতে তো চাই—কিন্তু ঘুমের জ্বালাতেই সব পণ্ড হয়ে যায়!'

'ও, ঘুমের জ্বালা? তার তো ফাইন ওষুধ রয়েছে—কাগজি লেবু।'

'কাগজি লেবু? ওতে কী হবে?'

'আরে বুঝলি না? ঘুম পেলে একটু কাগজি লেবুর রস চোখের পাশে টিপে দিলেই ল্যাঠা চুকে গেল। সারা রাতের মতো ঘুম একেবারে লেজ তুলে দৌড় মারবে!'

আইডিয়াটা মন্দ নয়। এই না হলে লাভলু পড়াশুনোয় অমন ইস্পাত হতে পারে!

'ঠিক বলেছ ভাই লাভলু। আজই কাগজি লেবুর ব্যবস্থা করা চাই। এত মাথা ঠুকেও বুদ্ধিটা তো মাথায় আসেনি এতদিন।'

আনন্দে লাফাতে লাফাতে চলে যায় বাবলু। আম্মার হেঁশেল থেকে যা করে হোক একটা কাগজি লেবু হাতাতে হবে। কিন্তু যত ভয় ঐ আপাটাকে। ওটা যেন শত্তুর। বলা-নাই, কওয়া-নাই একেবারে সামনের চুলগুলোকে টেনে ধরে। আর যা লাগে—ওরে বাবা, চোখ ফেটে দরদর করে পানি বেরিয়ে আসে। যা কিছুই করুক-না কেন, ওর চোখ এড়িয়ে করতে হবে। বাবলু তাই সুযোগ খুঁজতে লাগল।

শেষমেশ আপার চোখ এড়িয়েই একফাঁকে বাগিয়ে ফেলল একটি কাগজি লেবু—তারপর আঁশবটিতে কয়েকটা ফালি করে পুরে ফেলল পকেটে।

সন্ধেবেলায় পড়ার টেবিলে ঢুলুনির সঙ্গে সঙ্গে বাবলু এবার প্রয়োগ করল ওষুধ। ওরে বাবা, সে কী জ্বালা! জ্বালার চোটে পড়ার টেবিল ছেড়ে একেবারে তিড়িং-বিড়িং করে লাফানি শুরু করে দিল বাবলু।

ব্যাপার দেখে ছুটে এলেন আম্মা ও-ঘর থেকে—আর ছুটে এল সবচেয়ে বেশি ভয় যাকে, সেই আপা!

'আরে হল কী—এমন চেঁচামেচি আর লাফালাফি কেন?' আম্মা আর আপার প্রায় একই প্রশ্ন।

কিন্তু জবাব দেবে কে? বাবলু কি আর এ-জগতে আছে! চোখে যেন কে বিছুটি বুলিয়ে দিয়েছে। তিড়িং-বিড়িং লাফানি—আর 'মাগো মলাম গো, গেলাম গো' ছাড়া আর কিছুই নাই।

আম্মা তাড়াতাড়ি ধরে নিয়ে গিয়ে চোখ ধুইয়ে দিলেন—বাবা, এমন দুরন্ত ছেলে কি আর দুনিয়া জাহানে আছে? চোখে যে কী এমন করে লাগিয়েছে! এখন চোখদুটো ফিরলে হয়!

কিন্তু কে শোনে আম্মার বকবকানি! জ্বালার চোটে বাবলু প্রায় নীল হয়ে উঠেছে। তা হলে কী হয়, ঐ যে বলেছিলাম যত ভয় আপাটাকে নিয়ে—ওর চোখ এড়ানো চাট্টিখানি ব্যাপার নয়! কখন-যে পড়ার টেবিলের ওপর থেকে কাগজি লেবুর একটা ফালি উদ্ধার করে এনেছে, তা কেউ টেরই পায়নি। আম্মার কাছে সোজা এসে সেই ফালিটা ফেলে দিয়ে বলে বসল : 'ঘাবড়ানোর কিছুই নাই আম্মা, সাহেব ঘুম-তাড়ানোর জন্য চোখে কাগজি লেবুর রস দিয়েছেন। এই দেখ ব্যাপার।'

বাবলু তখনো আম্মার কোলে বসে। চোখ ধুয়েমুছে দেওয়া হয়েছে, এখন পাখার পরে পাখা চলছে শুধু। আগের চেয়ে অনেকটা ধাতস্থও হয়েছে বেচারি। মায়ের বুকের ওপর হেলে পড়েছে একেবারে।

এমন সময় আপার এই কথা শুনে, লেবুর রস দেওয়া চোখের মতন আম্মাও জ্বলে উঠলেন। বাবলুকে কোল থেকে ঠেলে নামিয়ে দিয়ে বললেন, 'বোকা ভোঁদড় কোথাকার, কে এ বুদ্ধি দিলে বল্? লেবুর রস দিয়ে ঘুম তাড়ানো হয়েছে? আর করবি কখনো, বল্ আর করবি কখনো?'

কী থেকে কী!—তিল থেকে যেন তাল হয়ে উঠল ব্যাপারটা। এতসব এলাজ-আপ্যায়ন, তার ওপর আম্মার কোলে চড়ার এতবড় চান্সটা একেবারেই ভেস্তে গেল! বাবলু দূরে দাঁড়িয়ে অপরাধীর মতো চোখ কচলাতে লাগল।

আম্মা আবার বকে উঠলেন, 'চোখ কচলাচ্ছিস্ কেন অমন করে? চোখদুটোর মাথা না-খেয়ে ছাড়বি না, নাকি।'

হ্যাঁ, মাথা খাওয়াই বটে! কিন্তু আপাটা কি কম শয়তান। ওর নাহয় ঘুম পায় না! ও বুঝবে কী করে? বাবলু তো যা-কিছু করেছে, সবই সরল বিশ্বাসেই করেছে—এমন যে হিতে বিপরীত হবে, তা কি আর ও জানত?

তবু ব্যাপারটা যদি এখানেই থামত। কিন্তু তার কি আর জো আছে? আপাটা যে এখনো জলজ্যান্ত দাঁড়িয়ে।

আম্মার তিরিক্ষি ব্যাপার দেখে ও আবার ফোড়ন কাটল, 'কিন্তু কাগজি লেবু ও পেল কোত্থেকে—নিশ্চয়ই হেঁশেল থেকে চুরি করেছে! অইটুকু ছেলের পেটে পেটে বুদ্ধি দেখ দেখি!'

লাঞ্ছনার ওপরে লাঞ্ছনা! বাবলু সেই আগের মতোই চোখ ঢেকে দাঁড়িয়ে রইল।

'বল্, কোথায় পেলি লেবু—চুরি করেছিস্?' আম্মা চেঁচিয়ে উঠলেন।

বাবলুর মুখে রা নাই।

'রা কাড়ছ না কেন?' আপা লাফ মেরে এসে এবার বাবলুর মাথার চুলগুলো টেনে ধরল। ভ্যাঁ করে কেঁদে ফেলতে ইচ্ছে করছিল বাবলুর—কিন্তু আজ কেঁদেও পার পাবার জো নাই!

শেষপর্যন্ত আব্বা এসে শেষরক্ষা করলেন। ব্যাপারটা সব শুনে বললেন, 'ভুল করে দোষ করে ফেলেছে—আর কখনো করবে না যা, তার জন্য অত শাসনের কী আছে?'

আজ থেকে আব্বার বসবার ঘরে পড়ার ব্যবস্থা হয়ে গেল বাবলুর। গায়ে যেন বাতাস লাগল ওর। ওখানে আপার শাসনও চলবে না—আর আম্মার বকুনিও শুনতে হবে না।

তাছাড়া আব্বাও বাড়ি থাকেন না প্রায় রাত দশটা পর্যন্ত! ও ঘরে বাবলুই সর্বেসর্বা—ঘুম পেলে ঘুমুবে—ঘুম না-পেলে আপনমনে পড়া করবে! তারপর আব্বা ফিরলে তাঁর সাথে খেয়েদেয়ে শুতে যাবে। বাবলুর মনটা খুশি হয়ে উঠল।

কিন্তু খুশি হলে কী হয়? স্কুলের কথাটা মনে পড়তেই আঁতকে উঠল বাবলু—কান ধরে বাইশবার উঠ-বস্ করা, সে কি সোজা ব্যাপার! তার থেকে রেহাই পাওয়া যাবে কী করে? ভেবেচিন্তে কূল-কিনারা পায় না বাবলু। না, পড়া তৈরি করা ছাড়া অন্য কোনো উপায় নাই। আর ঘুম তাড়াতে না-পারলে পড়া তৈরি করাও অসম্ভব।

পরদিন স্কুলে সেই একই অবস্থা! কান ধরে বাইশবার উঠ-বস্ করা, সেই জবাফুলের মতো মুখ লাল হয়ে ওঠা, শুকনো চোখ ফেটে পানি পড়া—সবই ঘটল ঠিক ঠিক আগের দিনের মতো।

ছুটির পরে লাভলু এসে বলল, 'কিরে চোখে লেবুর রস দিস্ নি?'

'দিই নি আবার। খু—ব শিক্ষা হয়েছে, আর নয়!'

'সে কী কথা! লেবুর রস দিলে তো ঘুম একেবারে লেজ তুলে ভাগে সারা রাতের মতো! তুই তাহলে ঠিকমতো দিতে পারিসনি!'

কাটা ঘায়ে নুনের ছিটে! বাবলু প্রায় খেঁকিয়ে উঠল: 'খুব ভালো করে দিয়েছি। আর তার বদলে চুলটানা, কানমলা, বকুনি সবই খেয়েছি, বুঝলে?'

'অ্যাঁ, ব্যাপার কী খুলে বল্ দেখি—লেবুর রসের জন্যে চুলটানা, কানমলা, বকুনি...।'

ব্যাপারটা বলতে গিয়ে বাবলু প্রায় কেঁদেই ফেলল! 'তোমার মতো ছেলের মাথা থেকে এমন একটা কুবুদ্ধি বেরুবে এ-আমি ভাবতেই পারিনি!'

লাভলু ওর অবস্থা দেখে মাথা চুলকে বলল, 'যাক যা হবার তা হয়েই গেছে—শোন্, তোকে ভালো একটা বুদ্ধি দেই—এতে চোখও জ্বলবে না, ঘুমও পাবে না—তার ওপর মনটাও ভরে থাকবে!'

এতক্ষণে বাবলুর আগ্রহ ফিরে এল! যতই হোক লাভলু পড়াশুনোয় একেবারে ইস্পাত। এত ধার যে গায়ে হাত দেয়া যায় না!

'বেশ বলো, করে দেখি আর একবার।'

'আচ্ছা তুই কী খেতে সবচেয়ে বেশি ভালোবাসিস বল্ দেখি!'

'কেন, রসগোল্লা!'

'ব্যস্, ঠিক হয়েছে।'

বাবলু হাঁ করে চেয়ে থাকে তার মুখের পানে।

'দেখ, যা করে হোক তোকে কিছু পয়সা জোগাড় করতে হবে। তারপর সেই পয়সা দিয়ে রসগোল্লা কিনবি। একটা কাপড়ে সেই রসগোল্লা বেঁধে পড়ার টেবিলের ঠিক ওপরে ঝুলিয়ে রাখবি। তোর চোখের সামনে টপ্‌টপ্ করে ঝরবে রসগোল্লার রস—সেইদিকে মাঝে মাঝে চাইলেই ব্যস্—যত খেতে মন চাইবে, ঘুমও তত দূরে ভেগে যাবে।'

আইডিয়াটা চমৎকার। এতে হাঙ্গামা নাই তেমন কিছু—আর চোখ জ্বলারও ভয় নাই একেবারে।

যত ফ্যাসাদ ঐ পয়সা জোগাড়-করা নিয়ে। আব্বার কাছে চাইলে সোজা বলে দেবেন, 'কী জিনিশের দরকার বল্, কিনে দেব।' আম্মার কাছে চাইলেই হাজার কৈফিয়ত দিতে দিতে প্রাণান্ত হতে হবে। আর আপার তো কথাই নাই! নিজেরা যা-মন-তাই কাজে ঝুড়ি ঝুড়ি পয়সা খরচ করবে—কেবল বাবলুর ব্যাপারেই হাজার রকমের কৈফিয়ত তলব!

তবে? পয়সা জোগাড় না-করা গেলে আইডিয়াটা কাজে লাগানো যাবে না। আর কান ধরে উঠ-বস করতে করতেই জানটা যাবে।

ভেবে ভেবে বাবলুর কান গরম হয়ে উঠল। স্কুল থেকে বাড়ি ফেরার সারা পথটাই ঐ এক ভাবনা তাকে ব্যাকুল করে রাখল। ব্যবস্থা একটা না-করলেই নয়। কিন্তু কী ব্যবস্থা করবে সে?

বুদ্ধি আঁটতে আঁটতেই কেটে গেল দু-তিনটে দিন। ঘুম তাড়ানোর এলাজটা হাতের পাশে এসেও ফসকে যাবে বোধ হয়।

সেদিন পা টিপে টিপে বাড়ি এল বাবলু। মাথার ওপর কাঠফাটা দুপুর খাঁ খাঁ করছে। পুরো বাড়িটায় কারো কোনো সাড়াশব্দ নাই। আব্বা গেছেন আপিসে। আম্মা বোধহয় খেয়েদেয়ে গা গড়াচ্ছেন একটু। আর আপা? ঠিক তো। আপা গেছে কলেজে! চট্ করে আইডিয়াটা খেলে গেল বাবলুর মাথায়! অমনি সোজা গিয়ে ঢুকল আপার ঘরে। আর আপার পার্সটা খুলে রসগোল্লা কেনার ব্যবস্থাটা করে ফেলল।

আপার ঘর থেকে পকেটে হাত পুরে সুড়সুড় করে বেরিয়ে এসে সে ঢুকল মায়ের ঘরে। আম্মা জেগে আছেন তখন। বললেন, 'কিরে এত দেরি করলি যে আজ!'

'আম্মা, আজ ছুটির পরেও আমাদের পড়া হয়েছে....পুরোনো পড়াগুলো আবার ঘুরিয়ে পড়ানো হচ্ছে কিনা! সামনে পরীক্ষা.....।'

'বেশ বেশ... ছুটির পরে স্কুলে খানিক-খানিক যদি পড়ে আসিস, তাহলে আর ভাবনা থাকে না, বাবা!'

আম্মা খুশি হয়ে ওঠেন। তারপর খেতে দেন বাবলুকে। বলেন, 'খেয়েদেয়ে রোদে রোদে ঘুরে বেড়াস না। ও-ঘরে গিয়ে একটু ঘুমুবি, তাহলে সন্ধেবেলায় আর ঘুম পাবে না।'

'না, আম্মা। আব্বার ঘরে যাওয়ার পর থেকে আর ঘুম পায় না একেবারেই।' আম্মার সামনে চট করে মিথ্যে কথাটা বলে ফেলে কেমন যেন কাঁচুমাচু হয়ে গেল বাবলু। কথাটা তার নিজের কানেও বাজল খট্ করে। এর আগে আর-কখনো আম্মার কাছে মিথ্যে বলে নাই সে।

'তোর আব্বা তো সন্ধেবেলায় থাকেন না বোধহয়। তবে...'

'নাই-বা থাকল আম্মা—কখন এসে পড়বে সেই ভয় থাকে বলেই তো ঘুম পায় না। দেখ না, ঠিক নটায় খেতে আসি।' বাবলু স্টেডি হয়ে গেল এখন।

হ্যাঁ, তা ঠিক। এই দু-তিনদিন থেকে বাবলুকে আর খাওয়ার জন্যে নটার সময় ঘুম থেকে ডেকে দিতে হয় না। কথাটা আম্মার বিশ্বাস হয়ে যায়। তিনি বাবলুর মাথায় হাত বুলিয়ে দেন।

ভাগ্যিস আপাটা নাই এখানে—থাকলে হয়তো লাগিয়ে দিত আম্মাকে সাত-পাঁচ করে। ওকে তো আর বিশ্বাস নাই! ও-যে শত্তুর! হয়তো জানলার খড়খড়ি সরিয়ে দেখে থাকবে এলার্ম-ঘড়িতে চাবি দিয়ে রেখে বাবলু ঘুমে ঢলে পড়েছে বইয়ের ওপর মাথা রেখে।

যাক্ বাবা, বাঁচা গেল। ও-ঘরে গিয়ে ঘুমটা তোর ঘাড় থেকে নেমেছে । রোজ রোজ বকাবকি, ওসব কি আর ভালো লাগে !

হাসি-হাসি মুখে মা মাছের মুড়োটা তুলে দেন বাবলুর পাতে।

'আর খেতে পাচ্ছি না, মা।'

'খেতে পাচ্ছি না কি রে? বেশি করে না-খেলে ভালো পড়াশুনো করা যায় কখনো !'

বাবলুর মনে হল কতকাল-যে আম্মা এমন করে আদর করেননি তাকে। বড় ভালো লাগে আজ আম্মাকে। মনে হল আম্মা তাকে সবচেয়ে বেশি ভালোবাসেন।

তবুও আসল কথাটা কোনোমতেই বলতে পারল না সে। যদি আবার চটে ওঠেন ! এই একটু আগে আপার ঘরে ঢুকে যে-কাণ্ডটা করে এসেছে, সেটাও ফাঁস করতে সাহস পেল না।

খাওয়াদাওয়া সেরে উঠে পড়ল সে। বলল : 'আম্মা, আমি আব্বার বসার ঘরে যাচ্ছি।'

'বেশ, যাও—রোদে রোদে আর কোথাও ঘুরতে যেও না কিন্তু।'

না, রোদে রোদে ঘুরতে গেলও না বাবলু।

খানিক পরে বাবলু এসে উঁকি মারল আম্মার ঘরে। আম্মা ঘুমিয়েছেন নিশ্চিন্তে। পা টিপে টিপে বেরিয়ে গেল এখন সে বাড়ি থেকে। একটা ঠোঙায় করে রসগোল্লা নিয়ে এসে আব্বার পানি-খাওয়ার গ্লাসটায় ভরে যত্ন করে লুকিয়ে রাখল আলমারির তলায়। সেই ফাঁকে আপার একটা শাড়ি এনে রেখে দিল আলমারির ফাঁকে। সাবধানের মার নাই। আপা কলেজ থেকে ফিরে এলে শাড়ি যদি না-পাওয়া যায় আবার !

আজও সন্ধে হল অন্যসব দিনের মতো। মায়ের পাশে ঘুরঘুর করছে বাবলু এখনো। মিছেমিছি খোঁজাখুঁজি করছে বই-খাতা। মনটা তার আজ খুশিতে ভরা। মায়ের বকা, আপার চুলটানা আর স্কুলে কান ধরে উঠ-বস করার হাত থেকে রেহাই পাবার একটা চমৎকার ব্যবস্থা করে ফেলছে সে। ভালোয়-ভালোয় সবকিছু চলে গেলে হয় এখন।

মনে-মনে স্কুলের একটা চমৎকার ছবি দেখতে পাচ্ছে সে। স্যার প্রশ্ন করার আগেই জবাব দিয়ে ফেলেছে—ঠিক লাভলুর মতন। বাবা, ঠিকমতো পড়া তৈরি করতে পারলে কে আর ঠেকাতে পারে ! বুদ্ধি তো তার কম নয়—লাভলুর সঙ্গে তফাত কোথায় তার? সে কি আর কম জানে কিছু ! বাবলু যেন তলিয়ে যায় তার নিজের মনের মধ্যে।

হঠাৎ আম্মা বলে ওঠেন, 'কিরে বাবলু পড়তে যাবি না আজ?'

'হ্যাঁ, ঠিক তো, বেশ আঁধার হয়ে আসছে। আর দেরি করা চলে না।'

'এই যাচ্ছি আম্মা।' বলেই চট্‌পট্ বই-খাতা নিয়ে চলে যায় সে আব্বার ঘরের দিকে।

একদম আইডিয়া-মতো কাজ। নড়চড় হবার কোনো উপায় নাই। আজ আর ঘড়িতে এলার্ম দিল না বাবলু। তার বদলে আপার শাড়ির কোনায় রসগোল্লার থোকা বেঁধে টেবিলের ঠিক ওপরে ঝুলে-থাকা ইলেকট্রিক পাখার একটি ব্লেডের সঙ্গে বহুকষ্টে শাড়ির একটা প্রান্ত আটকে দিল। একদম ক্যাপিটাল ! শাড়ির সুতোর ফাঁক দিয়ে চুঁয়ে চুঁয়ে রস ঝরে পড়তে লাগল টপ টপ করে সোজা টেবিলের ওপরে।

বাবলু একদৃষ্টে চেয়ে রইল সেইদিকে, আর মনে-মনে খাই-খাই করতে লাগল। চমৎকার ওষুধ। ঘুম তো ঘুম, ঘুমের বাপ পর্যন্ত ভেগেছে তার ত্রিসীমানা ছেড়ে।.... পড়ার কথা ভুলে গিয়ে বাবলু মনে-মনে শুধু রসগোল্লা গিলতে লাগল।

সামনে বিরাট একটা রসগোল্লার রাজ্য। ছোট-বড়, লাল-কালো হরেক রকমের। গাছের-পাতায় থরে থরে ঝুলছে গোল গোল হয়ে। বাঁধানো রাস্তার পাশে পাশে থাকে-থাকে সাজানো। সে আর গুনে শেষ করা যায় না। ডাইনে-বাঁয়ে সামনে-পেছনে সবদিকেই রসগোল্লা। শুধুই রসগোল্লা! কোনো-কোনোটা ড্যাব্‌ড্যাব্ করে চেয়ে আছে—কোনো-কোনোটা আবার মিটিমিটি হাসছে বাবলুকে দেখে।

ব্যাপার দেখে বাবলুর একেবারে চোখ জুড়িয়ে গেল—কাকে থুয়ে কাকে ধরবে। ক্রমেই এগিয়ে চলতে লাগল সে, সামনে আরো সামনে। কারো নরম গায়ে একটু টিপে দিয়ে, কারো তেলতেলে মাথায় ছোট্ট একটা টোকা দিয়ে চিট্‌চিটে হাত নিয়ে বাবলু এগিয়ে চলতে লাগল সামনের দিকে! গাছের পাতা থেকে টুপ্ করে দু-একটা পেড়ে নিয়ে মুখেও পুরতে লাগল মাঝে মাঝে। কারো 'পরে আবার শাসনের সুরে বলল, 'দেখেছ বেশি হেসেছ কি ব্যস্, টপ করে মুখে পুরে দেব।'

খানিক দূর এগিয়ে গিয়ে দ্যাখে, বাহ্ বেড়ে কাণ্ড! রসগোল্লারা সব একজোট হয়ে রীতিমতো আতশবাজি পুড়িয়ে খেলা জুড়ে দিয়েছে...হুশ করে হাওয়াই উঠেছে উপরের দিকে..তারপর ঐ তারার কোলে গিয়ে গুড়ুম করে ফেটে পড়ছে, শোঁ-ও-ও করে শব্দ তুলে তুবড়িবাজির আলোর গুঁড়ো ছড়িয়ে দিচ্ছে....আর গোল্লাদের তাই নিয়ে সে কী লুটোপুটি! হাতে হাতে সব রঙবাতি, তারাবাতি, ফুলঝুরি নিয়ে সে কী সব নাচানাচি!

বাবলু থমকে দাঁড়িয়ে গেল.....অমনি সেইসব তুবড়ি আর তারাবাতি জ্বলে জ্বলে আগুনের ছিটে এসে লাগতে লাগল তার ঘাড়ে মাথায়...আর শুরু হয়ে গেল চিটপিটে জ্বালা। মাথার চুলের ফাঁকে ফাঁকে, ঘাড়ের কাঁধের চামড়ার ওপরে সে কী জ্বালা...কে যেন, কারা যেন, কামড়াচ্ছে একধার থেকে... চুলকানির চোটে ঘাড়ের গোস্ত ফুলে ফুলে দাগড়া দাগড়া হয়ে যেতে শুরু হল।

আমোদ করতে এসে এ-তো ভালো যন্ত্রণায় পড়া গেল। কিন্তু তবুও নড়বার উপায় নাই—ততক্ষণে রসগোল্লার চিটচিটে রসে একেবারে সেঁটে গেছে বাবলু!

মাথা-ঘাড়-কাঁধ সব জায়গাতে খসড়-খসড় করে চুলকাতে চুলকাতে বাবলু ভাবতে লাগল কী করা যাবে এখন ...পালাতে না-পারলে তো আর উপায় নাই, জ্বালার চোটে প্রাণ যায়!

কী করে, কী করে—অমনি আবার ফ্যাসাদের ওপর ফ্যাসাদ বেধে গেল! একটা মোটা কেঁদো ধরনের রসগোল্লা একগোছা জ্বলন্ত তারাবাতি নিয়ে লাফ দিয়ে গিয়ে পড়ল বাবলুর ডান কানের ওপর, তারপর সে কী জ্বালা, আর কী টান! স্কুলে একটানা কান ধরে বাইশবার উঠ-বস করতেও কোনোদিন তার কানে এমন টান লাগেনি।

বাবলু অস্থির হয়ে একেবারে ভ্যাঁ করে কেঁদে উঠল! ওরে বাপ রে বাপ, কোথায় রসগোল্লা, কোথায় সেই আতশবাজি আর কোথায় কী! জলজ্যান্ত আপা এসে কান টেনে

ধরেছে তার! বাবলু হঠাৎ ঘুম ভেঙে কাঁদতে কাঁদতে দেখল, এদিকে একাকার ব্যাপার! শাড়ির বাঁধনের ফাঁক দিয়ে রসগোল্লার রস ঝরে ঝরে টেবিলটাকে একাকার করে ফেলেছে...আর রাজ্যের যত লাল মাথামোটা পিঁপড়েরা দল বেঁধে এসে আক্রমণ করেছে তার মাথা, ঘাড় আর সেই ঘাড়ের নিচের কাঁধটা!

পটাশ করে কানটা টেনে ছাড়িয়ে নিয়ে তিড়িংবিড়িং নাচ শুরু করে দিল বাবলু সারা ঘরময়! আপাও হাত চুলকাতে শুরু করে দিল। সর্বনাশ করেছে—এ হতচ্ছাড়া বুদ্ধি কে দিল রে তোকে। মা, মাগো দেখে যাও ব্যাপার!

আম্মা তসবির মালাটা হাতে নিয়েই ও-ঘর থেকে ছুটতে ছুটতে এলেন। 'হায়, হায় খেয়ে শেষ করে ফেলল রে একেবারে—খোল্ জামা প্যান্ট, ঝাড় মাথা ঘাড়...কে কোথায় আছিস আয় ছুটে আয় ঝাড়ন নিয়ে।' সে একেবারে হৈ হৈ হুলুস্থুল কাণ্ড শুরু হয়ে গেল!

বাবলুর গা মাথা ঝেড়ে দেয়ার পর আম্মা বললেন, 'উহ্ এমন দুরন্ত ছেলে হয়—দেখ দেখি, কেমন দাগড়া-দাগড়া হয়ে উঠেছে...।'

বাবলু আরও ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে লাগল...ফোঁপানিরা যেন একের পর এক হুড়হুড় করে এগিয়ে আসতে লাগল..ক্রমেই মাত্রাও বেড়ে উঠতে লাগল।

আপা অমনি হাত চুলকানো বন্ধ করে খেঁকিয়ে উঠল, 'দেখেছ মা, সাহেব আবার চুরি করেছে..আমার শাড়ি, রসগোল্লা কেনার পয়সা এসব কোথায় পেল ও!'

আম্মা জবাব দিলেন, 'তুই থাম্ দেখি বাপু—ছেলেটা এদিকে মরে যাচ্ছে, আর তোর ঐ সব হিশেব কষা! তোর শাসনেই তো ও এইসব করেছে।'

আম্মা আর-একবার বাবলুর ঘাড়ের পাশটাতে হাত বুলিয়ে দিলেন।

ঠিক এই সময়ই আব্বা এসে ঘরে ঢুকলেন: 'এ্যাঁ, এ-যে দেখি একাকার ব্যাপার!'

অমনি আপাটা ফোড়ন কাটল, 'দেখ গুণধরের কাণ্ড দেখ...ঘুম তাড়ানোর আয়োজন করেছেন পয়সা চুরি করে!'

তার মানে? ব্যাপারটা হঠাৎ যেন আঁচ করতে পারলেন না আব্বা। তারপর দেখেশুনে বললেন, 'ঘুম তাড়ানোর জন্যে যে-বুদ্ধিটা খরচ করেছিস, সেটা যদি লেখাপড়ায় লাগাতিস, তাহলে তো কাজ হত!'

'তা আর লাগায়নি? —এই দেখ ব্যাপার।'

আপা চট্ করে তার ছোট্ট পার্সটা খুলে একটুক্‌রা কাগজ আব্বার সামনে মেলে ধরল।

বাবলু তখনো ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদছে আর বলছে: 'আমি চুরি করিনি আব্বা, বলে নিয়েছি..।'

আব্বা পরিষ্কার দেখতে পেলেন আপার হাতে-ধরা মেলানো কাগজটিতে বাবলুর কাঁচা হাতের অক্ষরে লেখা রয়েছে:

> 'আপা, ঘুম তাড়ানোর দাওয়াই কিনব বলে তোমার কিছু পয়সা আর শাড়িটা নিয়ে গেলাম।
> আমি কিন্তু চুরি করিনি এবার।'

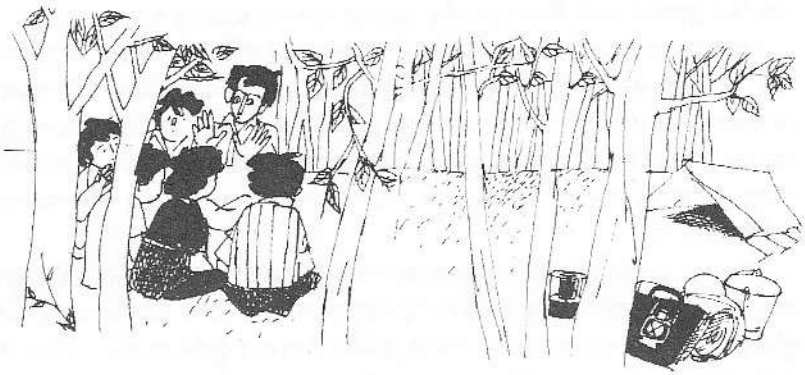

স্ট্যান্ডোফবিয়া

রাহাত খান

[দিলু, প্রদীপ, গজা, আকবর, সুনির্মল, জুয়েল—এরা সবাই চৌধুরীপাড়ার ছেলে, প্রায় সমবয়েসী। স্কুলের ছাত্র। সাজাহান ভাই রাজশাহীর লোক, বয়স একুশ-বাইশের ওপর, শুকনো কাঠির মতো চেহারা, মুখে একজোড়া বেমানান গোঁফ...সর্বদা ইংরেজি-বাংলা মিশিয়ে কথা বলেন। তাঁর ধারণা এটাই তাঁর অরিজিনিলিটি। চৌধুরীপাড়ার ছেলেদের নিয়ে সাজাহান ভাই একবার বনভোজনে গেলেন]

বেলা এগারোটায় আমরা মধুপুর গড়ে গিয়ে পৌঁছলাম। বাস রেখে দেয়া হল সরকারি ডাকবাংলোর দারোয়ান জুম্মা মিঞার কাছে। সবরকমের প্রস্তুতি নিয়েই আমরা এখানে এসেছি। আমরা তিন দিন অন্তত অরণ্য-জীবনযাপন করতে চাই, বাড়ি ফেরার সময় সাথে নিয়ে যেতে চাই এডভেঞ্চারের গন্ধ।

বাস রেখে দেওয়াতে মালপত্রের মোট নিজেদেরই বইতে হল। সাথের মালপত্র নেহাত কম বলা চলে না। খাবার, পানির বড় ব্যাগ, হাঁড়িকুড়ি, চায়ের সরঞ্জাম, তাঁবু, বাজার-সওদা, একটা কেরোসিনের চুল্লি, গ্রামোফোন ও রেকর্ডের বাক্স, টুকিটাকি আরো অনেক কিছু! মালপত্র নিয়ে আমরা অরণ্যের গভীরে ঢুকলাম।

শেষপর্যন্ত চমৎকার একটা জায়গা পাওয়া গেল। বহুদূর পর্যন্ত লোকালয়ের চিহ্নমাত্র নেই। চারদিকে ঘন গাছপালা। সারি সারি শাল, গজারি, শিশু, মহুয়া আর বাঁশঝাড়। এখানে ওখানে উঁচু-নিচু লাল মাটির টিলা। লাল মাটি ধুয়ে একটা ছোট্ট নদী এঁকেবেঁকে চলে গেছে দক্ষিণে।

জঙ্গলের ভেতর খানিকটা ফাঁকা জায়গা পেয়ে সেখানে তাঁবু খাটানো ঠিক হল। আমাদের সঙ্গে ছিল ড্রাইভার আলী মিঞা। সে তাঁবু খাটানোর ব্যাপারে আমাদের সাহায্য করল।

খিদেয় আমাদের পেট চোঁ-চোঁ করছিল। সাজাহান ভাই গম্ভীরমুখে সকলের মধ্যে সিদ্ধ ডিম, কেক আর কলা ভাগ করে দিলেন। আলী মিঞার ভাগে ডিম আর কলা বেশি পড়ল। সে নাশতা সেরে চলে গেল ডাকবাংলোর দিকে। সেখান থেকে বাস নিয়ে চলে যাবে শহরে। তিন দিন পর বাস নিয়ে আবার সে আসবে। আমরা আলী মিঞাকে রাস্তা পর্যন্ত এগিয়ে দিয়ে গেলাম। আমাদের মনে হল শহরের সঙ্গে সর্বশেষ সম্পর্কটুকুও যেন চলে গেল ড্রাইভার আলী মিঞার সঙ্গে।

আমাদের চুপচাপ ভাবভঙ্গি দেখে সাজাহান ভাই রীতিমতো খেপে গেলেন। গম্ভীর মুখে বললেন : একেই বলে ঘরকুনো বাঙালি। 'থ্রিডেইজে'র জন্য 'ফরেস্টে' এসেছি, এসেই গলা শুকিয়ে 'উড'। ইলিম্পো, ডিলিম্পো, য়েস্‌কট, টসকট্ কাঁহেকা! বুঝলি না বুঝি গালিটা? তা বুঝবি কেন? প্রত্যেক 'ওয়ার্ড' থেকে প্রথম অক্ষরটা নে। কী হল, ইডিয়েট? হ্যাঁ তাই। তোরা সব ইডিয়েট!

জুয়েল বলল : ভয় পেয়েছি? কখ্‌খনো না। একটু কী বলে মন খারাপ হয়েছে। তবে ভয় পাইনি। পরীক্ষা পর্যন্ত দিতে রাজি আছি। কী বলিস গজা?

: নিশ্চয়ই।

গজা এ-বিষয়ে জুয়েলের সঙ্গে একাত্মা। সবাই সাহসের পরীক্ষা দিতে রাজি হয়ে গেল জুয়েলের সঙ্গে গলা মিলিয়ে।

আকবর বলল : বলো না কী করতে হবে সাজাহান ভাই। আমরা চৌধুরীপাড়ার ছেলে, আমাদের অসাধ্য যে কিছু নেই তা দেখিয়ে দিই।

: হ্যাঁ, বলেন।

সুনির্মল সায় দেয়, সাজাহান ভাইয়ের গলার স্বর নকল করে বলল : সিম্পলি অর্ডার দিয়ে দেখেন ভগবানের আশীর্বাদে....

সাজাহান ভাই খুশি হয়ে বললেন : বেশ, বেশ, এই তো চাই। না রে, কোনো পরীক্ষা দিতে হবে না। তোদের চোখ-মুখ দেখেই আমি সব 'আন্ডারস্ট্যান্ড' করতে পারছি। আর কিছু না, তোরা আমাকে ১৯৫৭ সালের একটা অর্ডিনারি ঘটনা স্মরণ করিয়ে দিচ্ছিস। তখন আমার বয়েস ছিল এই ধর্ প্রদীপের মতো—বারো-তেরো বছরের মতো। আমাকে ছেলেমানুষ পেয়ে 'টাইগার'টা খুব লম্ফঝম্ফ করছিল। শেষপর্যন্ত কী আর করি, রেগে-মেগে...

দিলু বলল : তার মানে ১৯৫৭ সালে আপনি একটা বাঘ মেরেছিলেন সাজাহান ভাই....

সাতিশয় লজ্জিত হয়ে সাজাহান ভাই বললেন : সেই কলঙ্কের কথা আর তুলিস না দিলু। ভেবেছিলাম রয়েল বেঙ্গল টাইগার বুঝি 'কিল' করলাম, পরে দেখি একটা 'অর্ডিনারি টাইপের টাইগার'। মেজাজই খারাপ হয়ে গিয়েছিল সেদিন। 'ক্লিয়ার' মনে আছে, সেদিন রাগ করে বিকেলের চা খাইনি। বন্দুক নিয়ে সন্ধ্যা পর্যন্ত সুন্দরবনে 'স্ট্রল' করে বেড়িয়েছিলাম।

সাজাহান ভাই তাহলে বাঘ মেরেছিলেন! আমরা বিস্ময়ে, গর্বে, আনন্দে সাজাহান ভাইয়ের দিকে তাকিয়ে থাকি। সাজাহান ভাই বললেন : এসব অর্ডিনারি ঘটনা 'গো' করতে

দে। আসল কথা হল সাহস। হ্যাঁ, তোরা কেউ সাহস 'লুজ' করবি না কখনো। তাহলে আমি অত্যন্ত 'সরি' হব। নে, এইবার 'লাঞ্চের' ব্যবস্থা কর্। কিন্তু তার আগে একটা কথা তোদের 'সে' করতে চাই।

সাজাহান ভাই নিস্তব্ধ হলেন। বেশ কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে বললেন : কথাটা হল তোদের 'লিডার'কে?

কথাটা শুনে কেউ কিছু বলার আগে জুয়েলই বলল : কেন, আপনি আমাদের লিডার সাজাহান ভাই।

: নো, নো, আমি তোদের লিডার নই। আমি হলাম গিয়ে তোদের 'বিগ ব্রাদার', বেঙ্গলিতে তোরা যাকে বলিস বড়ভাই। লিডার আমরা একজন দল থেকে 'ব্রিং আউট' করতে চাই।

আমরা সবাই চুপ করে আছি দেখে সাজাহান ভাই বিরক্ত হয়ে বললেন: ধ্যাৎ! লিডার সম্পর্কে তোদের কোনো আইডিয়াই নেই। শোন্, আমি একটা প্রস্তাব দিই। সারাদিনের মধ্যে যে সবচে উদ্ভট আর মজার গল্প 'টেল' করবে, সেই হবে পরের দিনের জন্য লিডার। এইভাবে 'ডেইলি' আমরা লিডার ঠিক করব বুঝলি?

আমরা সবাই তক্ষুনি রাজি। বেশ মজার গন্ধ পাওয়া যাচ্ছে। সাজাহান ভাই বললেন : আমিও তোদের সঙ্গে 'সিরিয়াসলি' 'কমপিট' করব। মনে করিস না বিনা যোগ্যতায় 'লিডারশিপ' মেরে দিতে পারবি।

আমাদের অরণ্য-জীবন শুরু হয়ে গেল। আপাতত আমাদের লিডার নেই, সন্ধ্যা পর্যন্ত সবাই নিজের নিজের লিডার। আমাদের কাজ আমরা ভাগ করে নিলাম। দুপুরের খাওয়া সেরে উঠতে উঠতে বেলা সাড়ে তিনটা বেজে গেল।

খাওয়াদাওয়ার পর আমরা ক'জন নদীর তীর ধরে বেড়াতে গেলাম। আমরা মানে— আমি, দিলু, গজা আর সুনির্মল। চারদিক নিবিড় ছায়ায় ঢাকা। এখানে-সেখানে সোনার পাতের মতো রোদের টুকরো। আমাদের সাড়া পেয়ে কয়েকটা ধূসর রঙের তিতির ঝোপঝাড় ঝাপ্টে দূরে পালিয়ে গেল। গাছের পাতায় পাতায় ফাল্গুন মাসের প্রথম হাওয়া হু হু করছে।

বাইরে থেকে বেড়িয়ে যখন তাঁবুতে ফিরলাম, তখন সন্ধ্যা হতে দেরি নেই। পশ্চিমদিক রক্তবর্ণ। ঝিঁঝি ডাকছে। পাগলা হাওয়া বইছে চারদিকে।

জুয়েল নতুন দুটি ছেলেকে নিয়ে রাত্রিবেলাকার রান্নার উদ্যোগ করছে। জুয়েল বেশ ভালো রাঁধতে পারে। তার এই গুণটা খুব কাজে লাগছে। দুপুরবেলা জুয়েলের হাতের রান্না খেয়ে সাজাহান ভাই তো প্রশংসায় পঞ্চমুখ।

খাওয়াদাওয়ার পাট চুকল রাত ন'টার দিকে। তাঁবুর বাইরে মশাল জ্বালিয়ে দেয়া হল। আমরা সবাই গোল হয়ে বসলাম। এখন গল্প বলার আসর। গল্প হওয়া চাই উদ্ভট। কিন্তু সাজাহান ভাই সাবধান করে দিলেন, শুধু উদ্ভট হলেই চলবে না, সত্যি গল্প হওয়া চাই।

গল্পবলার তালিকায় মোট তিনজন নাম লেখাল। সুনির্মল, গজা আর প্রদীপ। দিলুকে গল্প বলার জন্য সবাই পীড়াপীড়ি করতে লাগল। কিন্তু দিলু কিছুতেই রাজি হল না। সে বলল : আমি ডেপুটি লিডার হতে চাই। লিডার হব না।

সাজাহান ভাই বললেন : ডেপুটি লিডার আমরা ভোটে ঠিক করব। কী বলিস জুয়েল?

জুয়েল বলল : সেই ভালো। নিয়ম করে দাও ভোট নেয়া হবে গোপনে।

: বহুত আচ্ছা।

আকবর বলল : এইবার গল্প শুরু হোক।

সাজাহান ভাই বললেন : সুনির্মল স্টার্ট কর্।

সুনির্মল শুরু করল : একেবারে খাঁটি সত্য কথা বলছি, দু-একটা ছোটখাটো ত্রুটি অবশ্য থাকতে পারে। সে যাকগে....ঘটনাটা ঘটেছিল গত বছর। পরীক্ষা শেষে মামা চিঠি লিখলেন যেতে। মামা-বাড়ি যেতে আমারও খুব ইচ্ছে করছিল। একদিন মামা-বাড়ি যাওয়ার জন্য বেরিয়ে পড়লাম। প্রথম রওনা হলাম এরোপ্লেনে। প্লেনের ড্রাইভার রবিদাস খুব মজার লোক। সে প্লেন চালাতে লাগল আর গান গাইতে লাগল। মাঝপথে প্লেন থামিয়ে গঞ্জ থেকে একসের গরম জিলাপি, আধসের কদমা কিনে নিলাম। মামা-বাড়ি গিয়ে পৌঁছলাম সন্ধ্যার দিকে। পৌঁছে যেতাম বিকালবেলায়। কিন্তু একটা বলদ আবার খোঁড়া ছিল। বলদটা কেনা হয়েছিল তেলিদের কাছ থেকে। তেলিরা আবার ঘোড়ার বদলে সময় সময় বলদ দিয়েই ঘানি টানে কিনা....

গল্প শুনে সাজাহান ভাই তো মহাখেপে গেলেন! এক ধমকে সুনির্মলকে থামিয়ে দিয়ে বললেন : পট্টি মারার আর 'প্লেস' পাস না হতভাগা? এরোপ্লেন দিয়ে তুই মামা-বাড়ি 'ওয়েন্ট' করেছিলি আর তাই আমরা 'বিলিভ' করব? পুরোনো ক্যালেন্ডার কোথাকার—

: বাহ্, গুলপট্টি মারলাম কিসে? আমি তো ঠিকই বলছি।

সুনির্মল একেবারে সত্যের অবতার!

: চুপ কর, ভেজাল 'পাউডার মিল্ক' কোথাকার।

সাজাহান ভাই একেবারে দাঁতমুখ খিঁচিয়ে ওঠেন।

: ওহ্ হো—

সুনির্মল এতক্ষণে সম্বিত ফিরে পায়। বলে : একটা কথা তোমাদের খুলে বলা হয়নি। ওটা আমার ভুল হয়েছে বলতে পারো। আসলে গাড়োয়ান রবিদাসের গরুর গাড়িটাকে মজা করে আমরা এরোপ্লেন বলে থাকি। তাহলে কথাটা দাঁড়াল গত বছর গরুর গাড়িতে করে আমি মামা-বাড়ি গিয়েছিলাম।

এবার গজার পালা। সুনির্মলের দিকে তাকিয়ে সে বলল,

: মামা-বাড়ি গিয়ে নিশ্চয়ই খুব করে মজার মজার খাবার খেয়েছিলি?

: সে আর বলতে....

সুনির্মল বলল, দুইবেলা ঘি-দুধ, রাবড়ি, সন্দেশ....

: কিন্তু আমি যা খেয়েছিলাম তা পৃথিবীতে কেউ খেয়েছে কি না সন্দেহ।

গজা নড়েচড়ে বসে গল্প বলতে শুরু করল : আসলে ব্যাপারটা ঘটেছিল একটা বাজি থেকে। আমার মামাত ভাই সোহেলের সঙ্গে সবসময়ই এটা-ওটা নিয়ে জেদাজেদি হয়। একদিন কোত্থেকে যেন উড়ে এসে সোহেল বলল : তুই দশ সের রসগোল্লা

খেতে পারবি গজা? আমি বললাম : দশ সের? ওরে বাবা, অত পারব না। পাঁচ সের ন্যাগাদ পারব।

মিটিমিটি হেসে সোহেল বলল : না তুই কোনো কম্মের নস, তা আমি জানি। গজা, তোর জন্য আমার খুব দুঃখ হয়।

সোহেলের বিদ্রূপ শুনে মেজাজ গরম হয়ে গেল। বললাম : বেশ খাব দশ সের রসগোল্লা। দশ সের না, এক মণ খাব। না, এক মণ কম হল, আমি দশ মণ রসগোল্লা খাব। খেয়ে তোকে দেখিয়ে দেব। আন্ দেখি দশ মণ রসগোল্লা।

সোহেল তেমনি শয়তানি হাসি হেসে বলল : তোর একটা গুণ আছে গজা। গুণটা হল, তুই কথায় একেবারে দুনিয়া উল্টে ফেলিস। কিন্তু কাজের বেলায় নিজেই উল্টে যাস।

আমি বললাম : বেশ তাহলে কাজ দিয়েই আমার কথা প্রমাণ করছি। চল্ মিষ্টির দোকানে যাই।

সোহেল রাজি হয়ে আমার সঙ্গে মিষ্টির দোকানে গেল। আমি একটুও কথা না বলে রসগোল্লা খেতে শুরু করলাম। প্রথম খেলাম দশ মণ। চারদিকে ভিড় জমে উঠল। মিষ্টিঅলা তাজ্জব বনে গেল। ব্যাপার দেখে সোহেলও ঘাবড়ে গেছে। সে বলল : আর খাস্‌নে গজা। অসুখ করে মরবি। আমি বললাম, তা হয় না। দশ মণ খেয়েছি, এবার আরো কিছু খেয়ে একটা রেকর্ড করতে চাই।

সবাই হা করে গল্প শুনছে। দিলু বলল : তা, তুই রেকর্ড করেছিলি?

: করেছিলাম বৈকি। সেবার দশ মণ রসগোল্লার ওপর আরো পঞ্চাশ মণ রসগোল্লা খেয়েছিলাম। আমার বিশ্বাস ওটাই খাওয়ার পরিমাণের দিক দিয়ে ওয়ার্ল্ড রেকর্ড।

: আমাদের বিশ্বাস—

আকবর নিশ্বাস ছেড়ে বলে : তোর মাথার সব ক'টা বল্টু খুলে কোথাও পড়ে গেছে। তা নইলে ষাট মণ রসগোল্লা খেয়েছিলি তুই, এটা আমাদের বিশ্বাস করতে বলিস?

গজা দুঃখিত হয়ে বলে : বিশ্বাস করা না-করা তোদের ইচ্ছে। আমি কিন্তু একেবারে সত্যিকথা বলছি।

: তোকে 'ম্যাড ডগে' কামড়ায়নি তো গজু?

সাজাহান ভাই সতর্কভাবে তাকান গজার দিকে, পাগল অনেকরকম 'সি' করেছি, কিন্তু ব্রাদার, তোর মতো এমন জাতপাগল কোথাও দেখিনি। তোকে আমরা আর কী বলি! আজ মোহাম্মাদ তোগলক বেঁচে থাকলে তিনি তোর 'ভ্যালিয়ো' বুঝতে পারতেন।

গজা বলে : আমি আবার বলছি, এটা সত্যি ঘটনা।

: সত্যি ঘটনা?

: আলবৎ সত্যি ঘটনা। স্বপ্ন দেখা কি মিথ্যে ব্যাপার বলতে চাও? আমি একদিন স্বপ্নে ষাট মণ রসগোল্লা খেয়েছিলাম। কি, হল এখন?

প্রদীপ কেন যেন হাসতে লাগল গজার কথা শুনে। হাসি কিছুতেই থামে না। দিলু বলল

: অমন করে হাসছিস কেন প্রদীপ? কী হয়েছে?

: খাওয়ার কথা শুনে হাসছি। ভুল করে আমিও একদিন খেয়ে বসেছিলাম কিনা। তবে গজার মতো অতটা নয়, সামান্য।

: স্বপ্নে খেয়েছিলি?

: না, না, স্বপ্নে খাব কেন?

প্রদীপ আপত্তি করে, তাকায় সাজাহান ভাই'র দিকে। বলে : গল্পটা তাহলে বলি সাজাহান ভাই। অপরাধ নেবেন না কিন্তু। আমি তো ইচ্ছে করে খাইনি, ভুল করে খেয়েছিলাম।

: 'সে' করতে শুরু কর্ বাপু। দেখি কোথাকার 'ওয়াটার' কোথায় গিয়ে 'স্ট্যান্ড' করে...

সাজাহান ভাই তাড়া দেন।

প্রদীপ বলে : কদিন আগের ব্যাপার। রাত্রিবেলা দাদুর ঘরে শুতে হয়েছিল। দাদু কবিরাজি করেন, বুড়ো মানুষ। আমি যখন শুতে গেলাম তখন দাদু পাশের ঘরে মা আর ছোট পিসির সঙ্গে গল্প করছেন। খুব ঘুম পাচ্ছিল। কিন্তু শুতে গিয়ে দেখলাম বিছানাটা জানালা দিয়ে পালিয়ে যাচ্ছে। আমার তখন খুব রাগ হল। আমি দরজা খুলে বিছানাটার পিছু নিলাম। বেরিয়ে বাগানে এসে দেখলাম তাজ্জব কাণ্ড। হাজী মোহাম্মদ মহসিন আর অঙ্কের পণ্ডিত যাদব চক্রবর্তী বসে আছেন বাগানের বেঞ্চে। আমাকে দেখে হাজী মোহাম্মদ মহসিন বললেন, তুমি একটা অঙ্ক করতে পারবে প্রদীপ? আমি বললাম, কী অঙ্ক? যাদব চক্রবর্তী উত্তর দিলেন। বললেন, অঙ্কটা খুব সহজ। কিউবের ফর্মুলা দিয়ে এশিয়া মহাদেশ ভাগ করতে হবে। আমি অঙ্ক করতে যাচ্ছিলাম, এই সময় ব্যাবিলনের রাজা সলোমান এসে হাজির হলেন। —প্রদীপ, রাস্তায় আমার রিক্শা দাঁড়িয়ে আছে। তোমার কাছে এক টাকার ভাংতি হবে? আমি বললাম, না, আমার কাছে হবে না। দাদুর কাছে হতে পারে। দাঁড়ান দাদুর কাছ থেকে পয়সা নিয়ে আসি। রাজা সলোমান বললেন, থাক্ লাগবে না। এসো আমরা ক্রিকেট খেলা দেখি।

চোখ ফিরিয়ে দেখি তাজ্জব ব্যাপার! আমাদের বাগানে ক্রিকেট খেলা চলছে। দক্ষিণদিক থেকে বল করছেন ফজল মাহমুদ। ব্যাট করছেন শিল্পী জয়নুল আবেদিন। উইকেট কিপারের দিকে তাকিয়ে আমি আরো অবাক। উইকেট কিপিং করছেন শেরে বাংলা এ. কে. ফজলুল হক। ফিল্ডিং দিচ্ছেন হানিফ মোহাম্মদ, হাটন, কবি উইলিয়ম শেক্সপিয়র আর ম্যাক্সিম গোর্কি। অন্য পাশে ব্যাট নিয়ে দাঁড়িয়ে আছি স্বয়ং আমি। খুব খেলা হচ্ছিল। আমি পিটিয়ে খেলছিলাম, প্রায় ওভারেই চারটা পাঁচটা চারের মার। হঠাৎ মাঠে এসে হাজির হলেন যাদব চক্রবর্তী। গম্ভীরমুখে বললেন, হোম-টাস্কের অঙ্ক কটা করেছ? আমি বললাম, অঙ্ক করতে চাই না। আমি ক্রিকেট খেলব আর ছবি আঁকব। শিল্পী জয়নুল বললেন, হাতটা কখনো নষ্ট কোরো না প্রদীপ।

গোর্কি বললেন, আমি এখন একটা ক্যাচ করব। একজন আম্পায়ার গান করতে করতে বলল, খেলা শেষ হয়েছে, এখন শুতে যাও প্রদীপ। আম্পায়ারের গান শুনে আমার বিছানাটার কথা মনে পড়ল। বিছানাটা পালিয়ে গেছে, আমি শোব কোথায়? গোর্কি বললেন, বিছানা পালিয়ে গেছে তাতে কী হয়েছে? হাজী মোহাম্মদ মহসিন বললেন, হ্যাঁ, তাতে কী হয়েছে?

তোমাকে আমি বিছানাটার কাছে নিয়ে যাব। আমি বললাম, তাহলে খুব ভালো হয়। আমার ঘুম পাচ্ছে। বিছানা নেই বলে শুতে পারছি না।

আমার সত্যিই ঘুম পাচ্ছিল। হাই উঠছিল আমার। হঠাৎ সেখানে এসে হাজির হলেন দাদু। তাঁর টেকো মাথাটা বিকটরকম বড় দেখাচ্ছিল। দাদু আমার হাত ধরতে চাইলেন। আমি দিলাম না। বললাম, দাদু, আমি কাল সকালবেলা হোম-টাস্ক করব। দোহাই আপনার, দয়া করে রাগ করবেন না। দাদু যেন কাঁদতে লাগলেন। বললেন, তাতে কী হয়েছে প্রদীপ, আমিও তো তোমার সাথে এক ক্লাসে ভর্তি হয়েছি, হোম-টাস্কের অঙ্ক নাহয় কাল সকালবেলায়ই করব। দাদুর কথা শুনে শেরে বাংলা এ. কে. ফজলুল হক আর উইলিয়াম শেক্‌সপিয়র খুব হাসতে লাগলেন।

: আমার কিন্তু 'ক্রাই' করতে ইচ্ছে করছে....

সাজাহান ভাই গোল হয়ে বসলেন। বিগলিত গলায় বললেন : তোর 'ব্রাঞ্চমিল' দেখে আমার 'সিম্পলি' ক্রাই করতে ইচ্ছে করছে রে.....

জুয়েল বলল : 'ব্রাঞ্চমিল' শব্দটার মানে কী সাজাহান ভাই?

: মানে তোর 'হেড' —মুণ্ডু... ...

সাজাহান ভাই রাগ করেন : ইংরেজি কি তোরা কিছুতেই 'লার্ন' করবি না জুয়েল? 'ব্রাঞ্চ' মানে কাণ্ড আর 'মিল' মানে কারখানা— সব মিলে হল কাণ্ডকারখানা, এটুকু বুঝতে পারছিস না পা-ঝাড়া কোথাকার?

প্রদীপ বলে : আমি কিন্তু শব্দটার অর্থ বুঝেছিলাম সাজাহান ভাই।

: সে কথা থাক্। পরে কী হল তাই শুনি ...

দিলু রায় দেয়।

সাজাহান ভাই বলেন : না না...শেরে বাংলা এ. কে. ফজলুল হক আর উইলিয়ম শেক্‌সপিয়র লাফিং করতে লাগলেন ঐ পর্যন্ত থাক্। পরে কী হল শোনার চেয়ে আগে কী হয়েছিল তা-ই বরং 'হিয়ার' করা যাক।

প্রদীপ বলল : দাদুর টেবিল থেকে এক গ্লাস পানি খেয়েছিলাম। খেয়েছিলাম সামান্যই, তবে ....

: এক গ্লাস পানি খেয়েই এই অবস্থা!

: পানিতে ছিল দাদুর কবিরাজি বড়ির গুঁড়ো। প্রদীপ রহস্যভেদ করে। বলে : সে রাতে বাগান থেকে আমাকে দাদুরা ধরে এনেছিলেন। এখন তিনি লজ্জায় কবিরাজি করাই ছেড়ে দিয়েছেন, রোজ রাতে সিদ্ধিও খান না ...

: তার মানে তুই সিদ্ধি 'ইট' করেছিলি?

সাজাহান ভাই প্রায় আর্তনাদ করেন।

: হ্যাঁ, করেছিলাম। ভুল হয়ে গিয়েছিল বলতে পারো।

প্রদীপ উৎসাহের সঙ্গে জানায়।

দারুণ গম্ভীর হয়ে যান সাজাহান ভাই। দিলুর দিকে তাকিয়ে বলেন : প্রদীপকে শাস্তি দিতে হবে। শাস্তিটা হল বাঁ-হাতের 'ওল্ড' আঙুল ছাড়া বাকি চারটে আঙুলে এক ঘণ্টা পঁচিশ মিনিট তাকে ঝুলে থাক্‌তে হবে সামনের ঐ জামগাছের ডালে। নিয়ে যা প্রদীপকে।

প্রদীপ হাউমাউ করে বলে : বাহ্, বললাম তো ভুল হয়েছিল। তার জন্য আবার শাস্তি কিসের?

: ভুল হয়েছিল বলেই তো 'ফোর ফিঙ্গারে' 'হ্যাঙিং'-এর শাস্তি দেয়া হল। 'নলেজ' থাকতে অর্থাৎ বেঙ্গলিতে তোরা যাকে বলিস জ্ঞান-থাকা-অবস্থা, সেই অবস্থায় সিদ্ধি ইট করলে তো মাথায় ইট 'ব্রেক' করতাম।

প্রদীপ নিরুপায় হয়ে বলে : ধরো যদি বলি আমি সিদ্ধি খাইনি। গল্পটা বানিয়ে বলেছি, তাহলে?

: তাহলে 'পানিশমেন্ট' একটু অন্যরকম হবে। সে অবস্থায় তুই দু-হাত দিয়েই গাছের ডালে 'হ্যাং' করতে পারবি। তবে নিচে থেকে তোর পায়ের পাতায় লম্বা ঘাসের ডগা দিয়ে কাতুকুতু দেয়া হবে। কোন্‌টা চাস তুই?

প্রদীপ রাগ করে গিয়ে জামগাছে উঠল। ঝুলে পড়ল বাঁ হাতে। সবাই আমরা নিচে দাঁড়িয়ে প্রদীপের শাস্তি দেখছি!

সময় উত্তীর্ণ হলে দিলু বলল : নেমে আয় প্রদীপ।

প্রদীপ বলল : আমি নামব না। তিন দিন তিনরাত আমি এইভাবে ঝুলতে থাকব।

: কিন্তু তার তো উপায় নেই, তুই হলি গিয়ে লিডার। তোর গল্পটাই আমরা সবাই উদ্ভট আর মজার বলে রায় দিয়েছি।

: বলো কী দিলু ভাই! সাজাহান ভাইও রায় দিয়েছে?

: হ্যাঁ, সাজাহান ভাইও রায় দিয়েছেন।

প্রদীপ লাফ দিয়ে গাছ থেকে নামল; মুহুর্মুহু স্লোগান উঠল : প্রদীপ কুমার শর্মা — জিন্দাবাদ! লিডার প্রদীপ জিন্দাবাদ!

রাতে আমরা সবাই ঘুমাতে গেলাম তাঁবুর ভেতরে। চারপাশে আগুনের কুণ্ড জ্বালিয়ে দেয়া হল। পালা করে পাহারা দেয়ার ব্যবস্থা করল প্রদীপ। ভোর-রাতের দিকে পড়ল আমার আর দিলুর পালা। আমরা পাহারা দিচ্ছি, পোকার ঐকতান শুনছি আর আকাশের তারা দেখছি। মিষ্টি বাতাস বইছে চারদিকে, বনেলা ঘাসের গন্ধ পাচ্ছি, চমৎকার লাগছে আমাদের । এই সময়েই হঠাৎ চেঁচিয়ে উঠল দিলু—

: হু কাম্‌স দেয়ার, হল্ট!

দিলুর হাতের গুলি-ভরা বন্দুক উদ্যত হয়ে উঠল। তাকিয়ে দেখি সামনে এক আবছায়া মূর্তি। বন্দুক দেখে মূর্তিটা থমকে দাঁড়াল। দু-হাত ওপরে তুলে বলল : ফ্রেন্ড!

কাছে আসতে দেখি লোকটা ন্যাশনাল পার্কের কেরানি খোদাদাদ ভূঁইয়া, ডাকবাংলোয় আমাদের সঙ্গে তাঁর দেখা হয়েছিল। খোদাদাদ ভূঁইয়া বললেন : তোমরা বুঝি এখানে তাঁবু ফেলেছ ... বেশ, বেশ ...

তিনি বার্মা চুরুট ধরালেন : আজ সারারাত আমাদের কারো ঘুম নেই। সারা জঙ্গল চষে ফেলেছি। একেই বলে ভাগ্যের ফের। নাইজিরিয়ার রাষ্ট্রীয় প্রতিনিধি মি. রঙ্গন কুফুয়া ঘণ্টা-দুই বাদে 'লাভলী'কে নিতে আসছেন। অথচ লাভলীর কোনো পাত্তা নাই। কখন যেন সুযোগ পেয়েছিল, সট্‌কে পড়েছে বিকালবেলা। এখন লাভলীকে মি. কুফুয়ার হাতে ফিরিয়ে দিতে না পারলে কী গতি হবে আল্লাই জানেন।

আমি বললাম : লাভলী কী হয় আপনার?

একমুখ ফ্যাঁসফ্যাঁসে পাতলা ধোঁয়া ছেড়ে খোদাদাদ ভূঁইয়া বললেন : লাভলীকে চেনো না বুঝি? লাভলী হচ্ছে বিন্ধ্যাচল এলাকার একটা পোষা হনুমান। মি. রঙ্গন কুফুয়ার পোষা হনুমান। মি. কুফুয়া বাংলাদেশে রাষ্ট্রীয় কাজে আসার পর হনুমানটাকে আমাদের হেফাজতে রেখেছিলেন। মি. কুফুয়ার এখানকার কার্যকাল শেষ হয়ে গেছে। তিনি এখন দেশে ফিরে যাচ্ছেন। আজ ভোর সাড়ে সাতটা নাগাদ তিনি মোটরে করে এখানে আসছেন লাভলীকে নিতে। কিন্তু কোথায় লাভলী!

হতাশায় মাথা নাড়েন ভূঁইয়া সাহেব। মি. কুফুয়াকে আমরা ডিনার পর্যন্ত আটকে রাখতে পারব। দেখ তো তোমরা এর মধ্যে লাভলীর দেখা পাও কি না। আর হ্যাঁ, সাবধান, গুলিটুলি ছুড়ো না যেন। মি. রঙ্গন কুফুয়া বলেন, লাভলী নাকি খুব সেন্টিমেন্টাল।

দিলু বলল : একটা হনুমানের জন্য মি. কুফুয়ার অত দরদ কেন বুঝতে পারছি না ...

কাটা ঘায়ে যেন নুনের ছিটা পড়ল ভূঁইয়া সাহেবের। বললেন : আসল কথা বললে খোদা ব্যাজার হবেন। তাই বলি না।

রাগ করে ভূঁইয়া সাহেব আবার বললেন : বুঝলে না? মি. রঙ্গন কুফুয়ার সাথে চেহারার আশ্চর্য মিল আছে লাভলীর। প্রায় হুবহু একরকমের চেহারা। যাকগে, মানুষের নিন্দা করতে নেই, তওবা তওবা ...

ভূঁইয়া সাহেব দুই গালে মৃদু চাপড় মারতে মারতে চলে গেলেন নদীর দিকে। তখনো আকাশে দু-একটা তারা আছে। চারদিক ফরসা হয়ে আসছে। পাখপাখালির গানে ভরে গেছে গড়। পুব আকাশের মেঘগুলো ক্রমে সিঁদুরের রং ধরছে।

দলের সবাইকে হনুমানটার কথা জানানো হল। ইতিমধ্যে আমাদের নাশতা হয়ে গেছে। গোল হয়ে বসে চা খাচ্ছি সবাই। হনুমানের কথা শুনে সাজাহান ভাইয়ের চোখমুখ গম্ভীর হয়ে গেল। বললেন : বড় ডেঞ্জারাস জিনিশ এই হনুমান। ১৯৫৭ সালে সুন্দরবন গিয়ে আমি অবশ্য গোটা তিনেক হনুমান 'ক্যাচ' করেছিলাম। কিন্তু সেই থেকে ঠিক করেছি, 'হ্যান্টিং' করি আর যা-ই করি, হনুমান বাদ দিয়ে করব।

প্রদীপ বলল : ১৯৫৭ সালে আপনি তাহলে তিনটা হনুমান মেরেছিলেন সাজাহান ভাই?

তাচ্ছিল্যের সঙ্গে সাজাহান ভাই বললেন : হনুমান আবার 'কিল্' করতে যাব কোন্ দুঃখে শুনি? 'কিল্' করার বস্তু নাকি ওগুলো? ১৯৫৭ সালে 'ওপেন হ্যান্ডে' তিনটা ধাড়ি হনুমান 'ক্যাচ' করেছিলাম।

দিনটা বেশ ভালোই কাটল আমাদের। আকবর আর সাজাহান ভাইয়ের ওপর খাবার তৈরির ভার দিয়ে দুপুরে ক্যামেরা নিয়ে বেরিয়ে গিয়েছিলাম অরণ্যে। নদীর ওপর বাঁকানো বাঁশের কঞ্চির 'পর বসে-থাকা একঝাঁক মাছরাঙা পাখির একটা ছবি তোলা হল। একটা কাঠবিড়ালী আমাদের দেখে পালিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করছিল। তাকেও তাড়াতাড়ি ধরে রাখার ব্যবস্থা করা হল ক্যামেরায়। দিলু কতকগুলো রঙবেরঙের ফুল সংগ্রহ করল। তার ওপর পথে

গান-নাচ তো ছিলই। হৈ-হুল্লোড় করে সারাদিন কাটিয়ে দিলাম। তাঁবুতে ফিরে এলাম সন্ধ্যার লাগ্ লাগ্। ফিরে এসে দেখি তাঁবু নিস্তব্ধ। কোথাও কারো সাড়াশব্দ নেই।

ভেতরে ঢুকে দেখি সাজাহান ভাই মলিনমুখে বসে আছেন। আকবরের হাতে বন্দুক। সাজাহান ভাই আমাদের সকলকে দেখে বিড়বিড় করে কী যেন বললেন, বোঝা গেল না।

প্রদীপ বলল, 'কী ব্যাপার আকবর ভাই?'

আকবর একবার সাজাহান ভাইয়ের দিকে তাকিয়ে উঠে আসে; প্রদীপের কানে কানে বলে : মি. রঞ্জন কৃষ্ণচূড়া গাছটার ডালে। বললে বিশ্বেস করবি না, হনুমানটার নজর শুধু সাজাহান ভাইয়ের দিকে। সাজাহান ভাই একবার তাঁবু থেকে সামান্য বেরিয়েছিলেন, অমনি হনুমানটার কী লম্ফঝম্ফ! সাজাহান ভাই দুই লাফে সেই-যে তাঁবুতে এসে ঢুকেছেন, নিজেও বেরোন না, আমাকেও বেরোতে দেন না।

ভাঙা গলায় সাজাহান ভাই বললেন : সব কথা আন্ডারস্ট্যান্ড করিয়ে 'সে' ... করতে পা ... পারছি না দিলু। আমি ব্রাদার কিছুক্ষণ আ ... আ ... গে তোতলা হয়ে গেছি। তো... তোতলা হয়ে গেছি ...

সাজাহান ভাইয়ের অবস্থা দেখে ও হনুমানটার কথা শুনে আমরা রীতিমতো উদ্বিগ্ন হয়ে উঠলাম। সেই সন্ধ্যায় মিটিং বসল। প্রদীপ বলল : ঘটনা যাই হোক, সাহস 'লুজ' করলে চলবে না। এখন দেখতে হবে আমাদের মধ্যে কে এমন সাহসী আছে যে হনুমানটাকে ধরতে পারে। নিদেনপক্ষে এই জায়গা থেকে তাড়িয়ে দিতে পারে জানোয়ারটাকে।

কেউ টু শব্দ করল না। ফলে চৌদ্দটি ভাঁজ-করা কাগজের টুকরোর একটায় 'হনুমান' কথাটা লিখে টুকরোগুলো ছড়িয়ে ছিটিয়ে দেয়া হল। প্রত্যেকেই খুশিমতো একটা করে টুকরো উঠিয়ে নিল। দেখা গেল সাজাহান ভাইয়ের কাগজেই 'হনুমান' কথাটা লেখা। অর্থাৎ শর্তমাফিক সাজাহান ভাইকেই এখন হনুমানের মোকাবেলা করতে যেতে হবে।

দলপতি প্রদীপ বক্তৃতা দেয়ার ভঙ্গিতে বলল : আসল কথা হল সাহস। সাহসের কাছে হনুমান কিছু না। আমাদের মনে রাখতে হবে কোনো অবস্থায়ই...

সাজাহান ভাই বাইরে যাওয়ার প্রস্তুতি নিতে গিয়ে জামার হাতা গুটাচ্ছিলেন। আর থাকতে না-পেরে চেঁচিয়ে বললেন : চুপ! আর একটা কথা বলবি তো 'লংজাম্প' দিয়ে এসে পড়ব। 'ক্লিন মার্ডার' করে ফেলব কিন্তু, হ্যাঁ।

সবাই চুপ। সাজাহান ভাইয়ের চোখমুখ ভয়ে, আশঙ্কায় চুপসানো। হাতা গুটানো শেষ হলে সাজাহান ভাই প্রায় কাঁপতে কাঁপতে জুতার ফিতা বাঁধলেন। একবার বাঁধা পছন্দ না-হওয়ায় ফিতা সম্পূর্ণ খুলে আবার বাঁধলেন। বিড়বিড় করে বললেন : ভারি একটা হনুমান, তাকে বুঝি ভয় করি আমি, হু! একবার পেয়ে নিই হনুমানের বাচ্চা হনুমানকে, সমানে লাথি চালাব। এই সাজাহানের একটা লাথি আগে খাক জানোয়ারটা, তখন বুঝবে ভদ্রলোকদের খামাখা উৎপাত করার মজাটা কী।

কিছুক্ষণ উদ্দীপনাময়ী বক্তৃতা দিলেন সাজাহান ভাই। বাইরে যাওয়ার সব প্রস্তুতি তার শেষ। জুয়েল কোনোরকমে একটা বড় মশাল জ্বালিয়ে দিয়ে এসেছে বাইরে গিয়ে। সে এসে জানাল হনুমানটা আগের জায়গা ছেড়ে তাঁবুর আরো কাছে একটা বদ্দিরাজ গাছের নিচু ডালে বসে আছে।

: ওয়াটার দে ...

সাজাহান ভাই আদেশ দেন। প্রায় মিনিট-পনেরো সময় ধরে একটু একটু পানি খেলেন সাজাহান ভাই। তারপর মুখ মুছে হঠাৎ ভাঙাগলায় প্রদীপের দিকে তাকিয়ে বললেন : আমি বরং না গেলাম প্রদীপ। কী বলিস ...

: কিন্তু ...

সাজাহান ভাই সবই বুঝলেন। প্রায় সম্মোহিতের মতো উঠে দাঁড়ালেন। বাইরে এলেন। আমরাও পেছনে পেছনে এলাম। এসে দেখলাম, সত্যি সত্যি একটা বিপুলকায় হনুমান কোলে হাত রেখে বদ্দিরাজ গাছের ডালে বসে আছে। পিট্‌পিট্ করে তাকাচ্ছে। সাজাহান ভাইকে দেখে হনুমানটা কিচিরমিচির শব্দ করে লম্ফঝম্ফ দিয়ে উল্লাস প্রকাশ করল।

: দেখলি, জানোয়ারটার ব্যবহার 'সি' করলি?

সাজাহান ভাই মর্মাহত হয়ে কাঁপাগলায় অভিযোগ করলেন। বললেন : বল্ দেখি দিলু, তোরা-যে এরকম একটা অসভ্য 'বিস্টের' কাছে আমাকে পাঠালি—আমি এখন কী করি! ইডিয়েটটা একবিন্দু ইংলিশ জানে না ...বকাবকি করেও তো লাভ নেই। এই দেখ, দেখ কীরকম ভ্যাঙাচ্ছে, ...উহ, এ অপমান অসহ্য!

: এগিয়ে যান সাজাহান ভাই।

প্রদীপ ভয়ে-ভয়ে উপদেশ দিল : তাড়া করে এগিয়ে গেলে দেখবেন হনুমানটা ভয়ে পালিয়ে গেছে ...

: এগিয়ে যাব ... 'ইউ মিন প্রসিড' করব? 'নো, নো, ইম্পসিবল!' ...

: ইমপসিবল? কেন সাজাহান ভাই ... ?

: স্ট্যান্ডোফবিয়া!

: স্ট্যান্ডোফবিয়া, সে আবার কী সাজাহান ভাই?

প্রায় কাঁদো-কাঁদো হয়ে সাজাহান ভাই বললেন : স্ট্যান্ডোফবিয়া কী তা কি আমিই জানি ব্রাদার। হাইড্রো-ফবিয়া আছে, সাইকো-ফবিয়া আছে... মনে হল স্ট্যান্ডোফবিয়াও থাকতে পারে! স্ট্যান্ড থেকে স্ট্যান্ডো, ... স্ট্যান্ড হল দাঁড়ানো। তা হলে স্ট্যান্ডোফবিয়া হল গিয়ে দাঁড়িয়ে থাকার রোগ। আমার পা বসে গেছে দিলু। বলছি বটে এগিয়ে যাও, কিন্তু আমি 'প্রসিড' করতে পারছি না.. ... ..

এই সময় হনুমানটা দু-তিনটা গাছ টপকে একদম মাথার উপরকার একটা গাছের ডালে এসে বসল। সাজাহান ভাই-এর দিকে তাকিয়ে কয়েকটা ভেংচি কাটল। তারপর ডালে দাঁড়িয়ে উদ্বাহু নৃত্য করতে লাগল।

সাজাহান ভাই-এর গলার স্বর একেবারে ভেঙে গেছে। দিলুর দিকে তাকিয়ে বললেন : নাচছে তো, দেখবে এক মিনিটের মধ্যেই কেমন একটা 'লো-জাম্প' দেয়। উহ, জানোয়ারটার মধ্যে একটু যদি ভদ্রতাবোধ থাকত !

সাজাহান ভাই দাঁড়িয়ে থেকে ঝিমোতে লাগলেন। বললেন : দিলু, মনে কোরো না আমি ভয় পেয়েছি। ভয় আমি পাইনি ব্রাদার। হনুমানজির অভদ্র ব্যবহারে আমি আসলে 'ইনসাল্টেড্ ফিল' করছি। আর শোনো, এইরকম দাঁড়ানো অবস্থা থেকে আমি যদি স্টার্ন ঝপ করে পড়ে যাই, তাহলে ফিট হয়ে গেছি তা যেন 'থিঙ্ক' কোরো না। 'স্ট্যান্ডোফবিয়া'র কথা বললাম না ! এটা হল 'স্ট্যান্ডোফবিয়া' ।

দিলুর উদ্দেশে কথাগুলো বলছিলেন সাজাহান ভাই। কিন্তু কোথায় দিলু ! কখন সে দল থেকে চুপিচুপি সরে পড়েছে, তা কেউ টের পায়নি। হঠাৎ একপাশে তাকিয়ে আমরা ভীষণ আঁতকে উঠলাম। হনুমানটা যে-ডালে বসে আছে, সেই ডালের কাছাকাছি আর-একটা গাছে বসে দিলু। হাতে এককাঁদি পাকা সাগরকলা।

: কাম, কাম ... ...

হনুমানটাকে দিলু ডাকল। হনুমানটা সেদিকে তাকিয়ে চোখ কপালে তুলে কিছুক্ষণ দেখল দিলুকে। তারপর সে কী উদ্দাম নৃত্য, সে কী কিচিরমিচির গান ! এ-ডালে সে-ডালে ঝাঁপ দিয়ে পড়তে লাগল হনুমানজি। তারপর একসময় লাফ দিয়ে পড়ল দিলুর ওপর। আমি আশঙ্কায় চোখ বুজলাম। চোখ খুলে তাকিয়ে আমরা সবাই তাজ্জব। হনুমানটা দিলুর কোলে আনন্দে, কৃতজ্ঞতায় মাথা ঘষছে। আর দিলু একটা একটা করে কলা তুলে দিচ্ছে হনুমানজির মুখে।

এই সময় একদল মশালধারী লোক এসে পৌঁছল সেখানে; খোদাদাদ ভূঁইয়া একজন কৃষ্ণকায় আফ্রিকানের সঙ্গে আমাদের পরিচয় করিয়ে দিলেন। তিনিই মি. রঙ্গন কুফুয়া। দিলু ততক্ষণে লাভলীকে নিয়ে নেমে এসেছে নিচে। মি. রঙ্গন কুফুয়া লাভলীকে পেয়ে আনন্দ ও কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করতে লাগলেন।

ওরা চলে যাওয়ার পর আলো জ্বালিয়ে আমরা বাইরে বসলাম। আকবর আর গজা রান্নার জোগাড়ে লাগল। কেরোসিনের চুল্লি জ্বালিয়ে চা করতে বসল জুয়েল। সাজাহান ভাই বললেন : যাক, হনুমানটা আমাদের মেডিকেল সায়েন্সের একটা উপকার করে গেল।

: কী রকম ?—প্রশ্ন করে সুনির্মল।

: এটা বুঝতে পারছিস না তেতো ওষুধ কোথাকার ! বলি, হনুমানজি না এলে 'স্ট্যান্ডোফবিয়ার' কথা জানতে পারত আজকের এই 'টুয়েন্টিনথ সেঞ্চুরি' ? দাঁড়া না, এবার ফিরে গিয়ে 'স্ট্যান্ডোফবিয়ার' ওপর রিসার্চ করব। ছেড়ে দেব ভেবেছিস ? কখ্খনো না— সাজাহান ওরকম ছেলেই না !

আক্কেল গুড়ুম

আবদুশ শাকুর

কী খেয়ালে আব্বা-আম্মা তার নামটা হঠাৎ আক্কেল আলী রেখেছিলেন কে জানে। তবে সেই ছোটবেলা থেকেই আক্কেলের সন্দেহ হচ্ছিল যে ব্যাপারটার নিশ্চয় কোনো তাৎপর্য আছে।

সে যাক। আক্কেল আলীর শিক্ষাজীবনের শুরুটাও বেশ প্রতিশ্রুতিশীল হয়েছিল। বাল্যশিক্ষা, নবনীতিসুধা ইত্যাদি শিশুপাঠ্য বইগুলি তরতর করে শেষ করে ফেলেছিল সে।

কিন্তু তারপরই গোল বেধেছিল। উচ্চশিক্ষা তো দূরের কথা, আব্বা-আম্মার একমাত্র সন্তান আক্কেল আলীকে তাঁরা হাজার নির্যাতনে, প্রলোভনেও কিছুতেই মাধ্যমিক শিক্ষার ঘরেও তুলতে পারলেন না।

বছরের পর বছর আক্কেল বাল্যশিক্ষা শিখতে শিখতেই গোঁফ-দাড়ি গজিয়ে ফেলল। ফলে রামসুন্দর বসাকের 'বাল্যশিক্ষা' নামক অমর পাঠ্যপুস্তকখানি ছত্রে ছত্রে তার মুখস্থ হয়ে গেল। না, পড়াশোনায় কোনো অবহেলা কিংবা অমনোযোগ আক্কেলের কখনো ছিল না।

শেষ পর্যন্ত নিরাশ হয়ে বাবা যখন বকুনি-পিটুনি দিয়ে শেষ চেষ্টা শুরু করলেন, আক্কেল তখন প্রতিবাদ না করে পারল না।

'আচ্ছা বাবা, তুমি আমার পড়াশোনায় গোল বাধাও কেন বলো তো?'

'আমি গোল বাধাচ্ছি, না তুই গোল্লায় যাচ্ছিস ব্যাটা বেআক্কেল?'

'দেখ বাবা ক্রোধ ভালো নয়। তুমিই আমার নাম আক্কেল রেখেছ। সুতরাং আমি বেআক্কেল হতে পারি না। বরং তুমি পরিষ্কার করে বলো, আমার কাছে কী চাও তোমরা?'

'তুই আমাদের একমাত্র সন্তান। তুই লেখাপড়া শিখে মানুষ হবি। এ ছাড়া তোর কাছে আমাদের আর কিছুই চাওয়ার নেই।'

'তাহলে তো কোনো গোলমালই নেই বাবা। আমিও তো লেখাপড়া শিখে শুধু মানুষ হবার চেষ্টাই করে যাচ্ছি।'

'বাপের সঙ্গে ইয়ার্কি করছিস ব্যাটা বেআদব কোথাকার! তোর সঙ্গীসাথী সবাই আজ ক্লাস নাইন-টেনের ছাত্র। একটু লজ্জাও হয় না গর্দভটার!'

'ক্লাস নাইন-টেন দিয়ে কী হবে বাবা? লেখাপড়া তো সব এই বাল্যশিক্ষাতেই আছে। মানুষ হবার শিক্ষাও ওতেই রয়েছে। হওয়ার চেষ্টাও সর্বদা করে যাচ্ছি।'

আক্কেল আলীর আত্মবিশ্বাসী জবাব শুনে তার বাবা একটু থতমত খেয়ে গেলেন। একটু পরেই অবশ্য দ্বিগুণ বিরক্তি ঝেড়ে মুখ ভেংচিয়ে প্রশ্ন করলেন,

'লেখাপড়া সব যদি এই বাল্যশিক্ষাতেই থাকে, তবে ভালো ছাত্ররা বি. এ.এম.এ. পড়ে কী জন্যে শুনি?'

'আমিও তো সে-কথাই বলি বাবা। অতসব পড়তে গিয়েই তো মূল পড়াগুলি ভুলে যায়। শিক্ষার সবকিছুই এ-বইতে আছে।

অতঃপর হতাশ পিতা প্রায় হাল ছেড়ে দিলেন। ভগ্নকণ্ঠে পুত্রকে তাঁর শেষ প্রশ্নটি করলেন,

'উচ্চশিক্ষা ছাড়া জীবনে বড় হওয়া যায়?'

'কেন যাবে না? বড় লোক হবার নিয়ম-কানুনও আমার বাল্যশিক্ষাতেই আছে—শেষ পাতায়। জগদীশবাবুর মতো বড় লোক। তুমি কিচ্ছু ভেবো না বাবা।'

ব্যস। আক্কেল মিয়ার বাপের আক্কেল হয়ে গেছে। ঘোর বিষয়ী মানুষ তিনি। বুঝে ফেলেছেন—একে দিয়ে আর যা হোক, লেখাপড়া হবে না। কিন্তু তাই বলে একমাত্র সন্তানকে ত্যাগও তো করা যায় না। এই কঠিন সংসারে ছেলেকে খালিহাতে অনিশ্চিত ভবিষ্যতের দিকে ঠেলে দিতে তো পারেন না।

তাই কিছু জমিজমা বিক্রি করে শহরে ছোট্ট একটা দোকানঘর নিয়ে আক্কেলকে বসিয়ে দিয়ে বুড়ো বাপ কিছুটা স্বস্তি পেলেন।

অতি নিষ্ঠার সঙ্গে বছরখানেক পরিশ্রম করেও আক্কেল আলী কিন্তু তার ব্যবসা রক্ষা করতে পারল না! এমনকি মূলধনটুকুও খুইয়ে বেচারা ফতুর হয়ে গেল। তার সততা এবং পরোপকারিতা কেন যে এমন নিষ্ফল হল, তা সে বুঝতেই পারল না।

দোকানটা ছিল মুদি দোকান। যখনি কোনো খদ্দের এসে জিজ্ঞেস করেছে,

'সর্ষের তেলটা খাঁটি তো?'

আক্কেল মিথ্যার আশ্রয় না নিয়ে বলে দিয়েছে,

'না ভাই। এতে বেশ খানিকটা বাদাম তেলের মিশেল আছে।'

বিরক্ত হয়ে ফিরে গেছেন খদ্দের। যখনি কোনো ক্রেতা নেহাত কৌতূহলবশত প্রশ্ন করেছে,

'পেঁয়াজের সের তিন টাকা। আপনাদের খরিদ কত?' আক্কেল আলী সদুত্তর দিয়েছে,

'আমার ভাই মাত্র দেড় টাকা সের খরিদ। অনেক আগের কেনা তো।'

'সের প্রতি দেড় টাকা লাভ করেন? কশাই নাকি আপনারা?'

গজর গজর করতে করতে বিদায় হয়েছেন ভদ্রলোক, নিশ্চিত ক্রেতা হওয়া সত্ত্বেও।

আবার যখন কোনো গরিব-দুঃখী এসে অনুনয়-বিনয় করে বলেছে :

'বড় বিপদে পড়ে এসেছি। একসের কেরোসিন আজ দয়া করে দিয়ে দিন। দামটা আমি কাল অবশ্যই দিয়ে যাব।' মানুষের দুঃখে দুঃখী হয়ে পরোপকার করতে দ্বিধা করেনি আক্কেল আলী। বাকি দিয়েছে। কিন্তু প্রায় ক্ষেত্রেই দামটা দিয়ে যায়নি কস্মিনকালেও।

যা হোক, এমনি করে বছর না ঘুরতেই দোকানটা যখন একেবারে বন্ধ হয়ে গেল, আক্কেল আলী তখন চোখে অন্ধকার দেখল। এবং ভেবে পেল না, কোন্ মুখে গিয়ে সে আবার বাবার কাছে হাত পাতবে।

কিন্তু ভুলটা কোথায় হল তা বের করতে আক্কেল তার বাল্যশিক্ষা, নবনীতিসুধা, ইত্যাদি বারবার পড়া পুস্তকগুলি পুনরায় মন দিয়ে পড়তে শুরু করে দিল। পুস্তকে অধ্যবসায়ী এবং স্বাবলম্বী হওয়ার উপদেশগুলি পড়তেই সে শপথ করল যে না-খেয়ে মরলেও কারো মুখাপেক্ষী সে কোনোদিন হবে না।

একবেলা উপোস দিয়ে সারাদিন কাজকর্মের সন্ধানে ছুটাছুটি করে দিনের শেষে ক্ষুধার্ত, ক্লান্ত এবং অবসন্ন আক্কেল আলী তার শূন্য দোকানঘরে ফিরে প্রায়ই ঘুমিয়ে পড়ে। আর নানান রকম দুঃস্বপ্ন দেখে।

এমনি সময় পর পর তিন রাত এক অদ্ভুত স্বপ্ন দেখে আক্কেল আলী রীতিমতো চিন্তায় ডুবে গেল। সৌম্যদর্শন অতি দয়াবান এক ফেরেস্তা এসে অতি ধীরে আক্কেলের শিয়রে উপবিষ্ট হন এবং তাঁর স্নিগ্ধ হাতখানি পরম স্নেহে আক্কেলের আতপ্ত কপালের ওপর রেখে অতি মধুর ভাষণে তাকে আহ্বান করেন—

'বাবা আক্কেল, ওঠো! জাগো! তোমার পবিত্র নামটুকুর মর্যাদা যে তোমাকে রাখতেই হবে। শীঘ্র তুমি আক্কেলের ব্যবসা ধরো, দেখবে তোমার কপাল খুলে যাবে।'

চোখ খুলতেই প্রথম দিন হতভাগ্য যুবক আক্কেলের বরং বড় দুঃখই হল। স্বপ্নটাকে একটা নিদারুণ বিড়ম্বনা বোধ হয়েছে তার। ভাবল ঘুমের দেশের ফেরেস্তারাও তার মন্দ ভাগ্য নিয়ে উপহাস করছে। তবে দ্বিতীয়বার একই স্বপ্ন তাকে কিছুটা ভাবিয়ে তুলেছে। কিন্তু হুবহু এই একই স্বপ্ন তৃতীয়বার দেখার পর চোখ খোলার সঙ্গে সঙ্গে আক্কেল আলীর মনের চোখও যেন খুলে গেল। মনে হল : তাই তো! দুনিয়ায় এত নাম থাকতে তার নামটা হঠাৎ আক্কেল আলী হতে গেল কেন? নিশ্চয় এর কোনো তাৎপর্য রয়েছে। স্বপ্নের আদেশটা পালন করেই দেখা যাক না।

অতএব, অবিলম্বে আক্কেল আলী নতুন উদ্যমে তার বহুদিনের বন্ধ-দোকানের ঝাঁপ আবার খুলে দিল। নতুন করে দোকানের নাম দিয়ে বড় হরফে সাইনবোর্ড ঝুলিয়ে দিল—

'আক্কেল গুড়ুম'

এখানে সুলভে অমূল্য আক্কেল বিক্রি হয়। জীবনের সকল বিপদে আপদে
আক্কেলই আপনার একমাত্র আপন।
প্রোপ্রাইটর : আক্কেল আলী।

নতুন ব্যবসা। তাও আবার চোখে লাগার মতো কোনো জিনিশপত্র নেই, শুধু কথা বিক্রির দোকান। তাই লোক জমিয়ে খদ্দেরের দৃষ্টি আকর্ষণ করার উদ্দেশ্যে আক্কেল আলী তার কৌতুকপ্রদ সাইনবোর্ডখানির নিচে দাঁড়িয়ে উদাত্ত আহ্বান-করতে লাগল—

'আসুন ! আসুন ভাইসব ! নিয়ে যান। আক্কেল নিয়ে যান। পানির দামে অমূল্য আক্কেল—এক টাকা, দুই টাকা, তিন টাকা ! এই যে নিয়ে যান, যার যা প্রয়োজন ! আক্কেল ! আক্কেল !'

আক্কেল আলীর এই বিচিত্র কাণ্ডকারখানা দেখে তার আশপাশের দোকানীরা তো হতবাক। এমনিতেও সকলের মতে আক্কেলের সততা, সরলতা, আর পরোপকারের পরাকাষ্ঠা তাদের ব্যবসার অনেক ক্ষতি করেছে। অবশ্য তাকে তারা এদ্দিন আস্ত একটা উজবুকই ধরে নিয়েছিল ! এখন সকলে ধরে নিল, ব্যবসায় শোচনীয় ব্যর্থতা নির্ঘাত আক্কেল আলীর মস্তিষ্কবিকৃতি ঘটিয়েছে।

আক্কেল আলী কিন্তু সেই লাজুক মিতভাষী মানুষটি আর নেই। সে অবিরাম বক্তৃতা দিয়েই চলেছে,

'নিয়ে যান ভাইসব ! অমূল্য আক্কেল'—

'কত দাম মিয়া তোমার আক্কেলের ?'

ইতোমধ্যে বেশ লোক জমে গিয়েছিল। সমবেত জনতার মধ্য থেকে একজন অতঃপর কৌতূহল প্রকাশ করলেন। আক্কেলও সেয়ানার ভঙ্গিতে জবাব দিল—

'আক্কেলের দাম কত ? আপনার পকেটের দাম যত। আক্কেলের দাম হয় না মিয়াভাই। এ অমূল্য জিনিশ। নিয়ে যান যার যা প্রয়োজন–এক টাকার, দুই টাকার'—

'তাহলে আমাকে এক টাকার আক্কেল দাও দেখি মিয়া।'

ভিড় ঠেলে বেরিয়ে এগিয়ে এলেন ভদ্রলোক—আক্কেলের পয়লা খদ্দের। বিসমিল্লাহ্ পড়ে টাকাটা পকেটে পুরে নিয়ে আক্কেল ঘরে ঢুকে গেল। ঘরের দেয়ালে বিভিন্ন পেরেকের সঙ্গে ঝুলিয়ে–রাখা ছোট–ছোট টুকরো–কাগজের একখানি ছিঁড়ে এনে লোকটির হাতে দিল। কাগজখানিতে দ্রুত নজর বুলিয়েই ভদ্রলোক তেলেবেগুনে জ্বলে উঠলেন—

'আচ্ছা ধড়িবাজ তো হে তুমি ! এটা একটা আক্কেল হল ? আর এ–বাজে কথাটুকুর দাম একটি টাকা ? ভালো চাও তো এক্ষুনি মানে মানে আমার টাকাটা ফেরত দিয়ে দাও।'

আক্কেল আলী সবিনয়ে নিবেদন করল,

'ভাই সাহেব ! এক টাকা কেন, লাখ টাকায়ও এই আক্কেলটুকুর দাম হয় না। আপনি কি সেই গণকের ঘটনা জানেন না ?'

'কী ঘটনা ?'

যাহোক আক্কেলের বক্তব্যটা অন্তত শুনতে রাজি হলেন ভদ্রলোক। আক্কেল আলী তখন সমবেত জনতাকে সম্বোধন করে বক্তৃতার ঢঙে ঘোষণা করল,

'ভাইসব ! এই ভদ্রলোককে আমি আমার আক্কেলের দাম ফেরত দিয়ে দিচ্ছি। আর তার কাছে বিক্রি-করা আক্কেলটুকু আপনাদের সবাইকে আমি উপহার স্বরূপ দান করে দিচ্ছি, আর সেই গণকের কাহিনী শোনাচ্ছি। শুনে সন্তুষ্ট হলে আপনারা আমাকে যার যা খুশি প্রতিদান করতে পারেন। এই ভদ্রলোককে দেয়া কাগজখানিতে লেখা আক্কেলটুকু হল—'সর্বদা সুন্দর করিয়া কথা বলিবে।'

গল্প শোনার আগ্রহে সকলে নড়েচড়ে আরেকটু ঘন হয়ে এল। আক্কেল আলী তার বয়ান শুরু করে দিল :

'এক দেশের এক বাদশাহ একবার স্বপ্নে দেখলেন যে তাঁর সব কটি দাঁত পড়ে গিয়েছে। জেগেই তিনি চিন্তান্বিত হয়ে রাজ্যের সেরা গণক ডাকিয়ে তাঁর এই অদ্ভুত স্বপ্নের ব্যাখ্যা জানতে চাইলেন। স্বপ্নের বিবরণ শুনেই গণক বলে উঠল—অতি খারাপ খোয়াব দেখেছেন হুজুর ! আপনার যত আত্মীয়স্বজন সব আপনার চোখের সামনেই মরে সাফ হয়ে যাবে। আর যায় কোথা ! ব্যাখ্যা শুনেই বাদশাহ ক্ষিপ্ত হয়ে উঠলেন এবং তৎক্ষণাৎ গণকের ফাঁসির হুকুম দিয়ে দিলেন। অতঃপর তলব দিলেন রাজ-গণককে। স্বপ্নের বিবরণ শুনে ইনি খুশিতে বাগ্ বাগ্ হয়ে বলে উঠলেন—সোবাহানাল্লাহ। মাশাল্লাহ্ ! বড়ই খুশির খোয়াব জাঁহাপনা ! এই স্বপ্নের অর্থ হল, আপনার সকল আত্মীয়স্বজনের মধ্যে আপনিই হবেন সবার চেয়ে দীর্ঘজীবী। তাঁর স্বপ্নের এই ব্যাখ্যা শুনে বাদশাহ তো আনন্দে আটখানা। এবং লম্বা ইনাম দিয়ে গণক বিদায় করলেন।

'এখন দেখুন ভাইসব ! দুই গণকের ব্যাখ্যা তো মূলত অভিন্ন। অথচ কথাটা সুন্দর করে বলতে জানলে বখশিশ, আর না-জানলে ফাঁসি।'

আক্কেল আলীর এক টাকার আক্কেলের তাৎপর্য শুনে সমবেত শ্রোতৃমণ্ডলী মুগ্ধ হয়ে সকলে তাকে সানন্দে এক এক টাকা দান করল শুধু একজন ব্যতীত। একে একে সবাই চলে গেলে সেই যুবকটি এগিয়ে এসে বলল—

'দেখি মিয়া আমাকে আনা-চারেকের আক্কেল দাও তো !'

আক্কেল আলী ঢ্যাঙা ছেলেটির ব্যবহারে বিরক্ত হয়ে বলল—

'কী বললে ? চারআনার আক্কেল ? তোমার নামটা কি ভাই জাহেল ?'

'আমার নাম ? আমার আব্বা তো ডাকে বেআক্কেল।'

'বিলকুল ঠিক নাম। বেআক্কেল না হলে কি কেউ মাত্র এক সিকের আক্কেল চায় ? তা বেআক্কেল ব্যাটার বাবার নামটাও তো একটু জানতে ইচ্ছে হয়।'

'আব্বার নাম ? আম্মার মুখে তো শুনি কেবল কঞ্জুষই বলেন।'

'বড়ই যুৎসই। কঞ্জুষের পোলা না হলে কি মাত্র পঁচিশ পয়সার আক্কেল চায় ? সে যাক। এখন বলো দেখি, চারআনার আক্কেলে তোমার প্রয়োজনটা কী ?'

'কিচ্ছু না। শুধু আব্বাকে জব্দ করতে চাই। আমাকে যেন কথায় কথায় বেআক্কেল না ডাকতে পারে—এক কথায় কেবল বলদই ডাকে।'

'আহা হা ! বলদও ডাকে নাকি তোমাকে ?'

'শুধু কি ডাকে ? বলদের কাজও করায়। সর্ষের তেলের বড় কারবার আছে আমাদের। আব্বা দিনরাত ঘানি টানায় আমাকে দিয়ে।'

'বাহ্ তবে তো তোমার পয়সার অভাব থাকার কথা নয় হে। টাকা দুয়েকের আক্কেল কিনে নিয়ে গেলে তো একেবারে তোমার কঞ্জুষ বাপকে দিয়েই ঘানি টানাতে পারবে।'

'হুঁ! ঘানি টেনে আব্বা আমারই তেল বের করবে। চেনো না আমার বাবাকে। দাও দেখি মিয়া পারলে আনা-চারেকের আক্কেল। দেরি হয়ে যাচ্ছে।'

পয়সাটা গুনে নিয়ে আক্কেল আলী পেরেকে গাঁথা টুকরো-কাগজগুলির একখানি ছিঁড়ে বেআক্কেলকে দিয়ে দিল।

বেচারা বেআক্কেল বেশ হাসিখুশি মুখে বাড়িতে পা দিতেই তার বদমেজাজি বাবা খেঁকিয়ে উঠল—

'কোথায় ছিলি সারাদিন ব্যাটা বেআক্কেল?'

ছেলে কিন্তু বেশ আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে আজ ফিরে দাঁড়াল। এবং বিনীত কণ্ঠে প্রতিবাদ করল,

'দেখ বাবা তুমি আমাকে আর বেআক্কেল ডাকতে পারো না। কেননা আমার কাছে অন্তত পঁচিশটি পয়সার আক্কেল আছে।'

'কী বললি? পঁচিশ পয়সার আক্কেল? সেটা আবার কী?'

হাবাগোবা ছেলেটির মুখে জীবনে এই প্রথম এবং উদ্ভট প্রতিবাদ শুনে হঠাৎ হতভম্ব হয়ে গেল বাপ। ছেলে কিন্তু একই রকম আত্মতৃপ্তির সঙ্গে জবাব দিয়ে গেল—

'শহরে একটা নতুন দোকান খুলে এক জ্ঞানী লোক বেশ সস্তায় আক্কেল বিক্রি করছিল। সবাই এক এক টাকার করে নিয়ে যাচ্ছিল। আমি দর-কষাকষি করে মাত্র চারআনার আক্কেল নিয়েছি।'

ছেলের বিবরণ শুনে বাপ আরো বিভ্রান্ত হয়ে বলল—

'তোর কথাবার্তা তো আমি কিছুই বুঝতে পারছি না। দেখি ব্যাপারটা কী?'

'তুমি তো পড়তে জানো না বাবা। দাঁড়াও আমি বলছি।'

বাবার কৌতূহল দেখে ছেলে উৎসাহিত হয়ে মহানন্দে পকেট থেকে চিরকুটখানি বের করল, এবং উচ্চকণ্ঠে পড়ে শোনাল :

'পথে ঘাটে ঝগড়া বিবাদ বাধিলে তামাশা দেখিও না।'

শুনেই বৃদ্ধ কঞ্জুষ মাথায় হাত দিয়ে বসে বুক চাপড়াতে লাগল—

'এই বাজে কথা লেখা কাগজের টুকরোখানির জন্য তুই আস্ত একটা সিকি খরচ করে এসেছিস? হায়রে আমার মেহনতের পয়সা।'

'বাবা তুমি বুঝতে পারছ না, বাজে কথা নয়। আরেক ভদ্রলোকও—'

'চুপ বেআদব কাঁহাকা! আবার মুখে মুখে কথা বলে। শিগগির চল্। যত বড় ধাপ্পাবাজই হোক, আমি তাকে দেখে নেব। হায়রে আমার নসিব। পঁচিশটি পয়সা। গোটা একটা সিকি!'

বিলাপ করতে করতে বুড়ো কঞ্জুষ তার বেআক্কেল ছেলেকে নিয়ে ঊর্ধ্বশ্বাসে শহরের উদ্দেশে ছুটল। এবং দোকানে পৌঁছেই দরোজায় দাঁড়ানো আক্কেল আলীকে পেয়ে কঠিন ক্রোধে ফেটে পড়ল—

'ব্যাটা ফক্কড় ! চালবাজির আর জায়গা পাও নি ! ভালো চাও তো শিগগির আমার ছেলের পয়সা ফেরত দাও।'

আক্কেল আলী ভাবল—একে তার নতুন ব্যবসা, তাতে আবার প্রতিবেশী দোকানীরা সবাই তার উপর বিরূপ। সুতরাং মাথা গরম না করেই সে জবাব দিল—

'এর মধ্যে কত ভদ্রলোক কত টাকার আক্কেল নিয়ে গেল আমার দোকান থেকে। কই, কেউ তো টাকা ফেরত চাইতে আসে নি ! আর আপনারা মাত্র চারআনা পয়সা—'

'দেখ, ওসব আমি বুঝি না, বোঝার দরকারও নেই। আমার ছেলেকে উজবুক পেয়ে তুমি উল্লুক বানিয়েছ। এখন ভালোয় ভালোয় পয়সাটা ফেলবে কিনা বলো। নইলে—'

'তা ভাই অত রাগারাগির কী আছে? চারআনা পয়সাই তো। সেটা আমি ফেরত দিয়ে দিচ্ছি। তবে আগে আমার আক্কেলটুকু ফিরিয়ে দিন।'

কঞ্জুষ লোকটার ভাবসাব দেখে ভড়কে গিয়ে আক্কেল আলী পলকে সিদ্ধান্ত নিল যে একে বুদ্ধি দিয়েই ঘায়েল করতে হবে। ওদিকে ক্ষুব্ধ কঞ্জুষ ততক্ষণে ছেলের পকেট থেকে চিরকুটখানি বের করে নিয়ে কুঁচকে দুমড়ে দলা পাকিয়ে আক্কেল আলীর পায়ের কাছে ছুড়ে মেরে বলল—

'এই নাও তোমার আক্কেল। ধুয়ে খাও তুমি।'

গেঁয়ো মুর্খটার একের পর এক দুর্ব্যবহারে আক্কেল আলীর ধৈর্যের বাঁধ এবার ভেঙে যাবার উপক্রম হল। তবু সে বেশ শান্ত অথচ দৃঢ় কণ্ঠে বলল,

'জি না জনাব। শুধু চিরকুটখানি ফেরত দিলেই চলবে না। কাগজে লেখা আক্কেলটুকু তো ইতিমধ্যেই আপনার ছেলের মস্তিষ্কে ঢুকে গেছে। সুতরাং—'

'সুতরাং কী?'

কঞ্জুষ রীতিমতো অধৈর্য হয়ে উঠল।

'আপনাকে একটা ওয়াদা করতে হবে—'

'আবার ওয়াদা কিসের হে?'

ঠোঁটের কোণে ধূর্ত হাসির রহস্য ফুটিয়ে আক্কেল আলী এবার তার কঠিন নির্দেশ জারি করল,

'আমার কাছে আপনাকে এই মর্মে অঙ্গীকারপত্র লিখে দিতে হবে যে, আপনার ছেলে আমার কাছ থেকে নেয়া এই আক্কেল কখনো, কোথাও কোনো পরিস্থিতিতেই ব্যবহার করতে পারবে না।'

'তার মানে?'

চোখমুখে একটা কুটিল হাসি ছড়িয়ে আক্কেল আলী বুঝিয়ে দিল—

'মানে, পথে-ঘাটে ঝগড়া-বিবাদ বাধতে দেখে ফেললেই আপনার ছেলেকে তামাশা আগাগোড়া দেখেই যেতে হবে—কেটে পড়বে না। আর তামাশা দেখেনি প্রমাণিত হলে আমার কাছে আপনাকে পুরো একশো টাকা জরিমানা আদায় করে দিতে হবে।'

শর্তের বিবরণ শুনে কঞ্জুষ বিন্দুমাত্র চিন্তাভাবনা না করেই সম্মত হয়ে গেল।

'ঠিক আছে, ঠিক আছে। তবু আমার মেহনতের পয়সা তুমি ফেরত দাও জলদি।' আক্কেল আলী চটপটে মুচলেকাখানি লিখে নিয়ে তার ওপর কঞ্জুষের আঙুলের ছাপ আর বেআক্কেলের দস্তখত নিয়ে নিল। পঁচিশটি পয়সাও অবশ্য ফেরত দিয়ে দিল।

কিছুদিন পর আক্কেল আলীর দোকানের মুখোমুখি দোকানটিতে রাজবাড়ির দুই ফেউ-এর মধ্যে তুমুল ঝগড়া বেধে গেল। একজন রাজার ডানের উজিরের চেলা। অপরজন তাঁর বামের উজিরের চামুণ্ডা। রাজবাড়ির এহেন টাউটের দল সর্বত্র সুবিদিত। এরা রাজা-উজিরদের তোষামোদ এবং চাটুকারিতায় সকাল সন্ধ্যা কাটায়। আর সেই মূলধনের জোরে দিবারাত্র আইনের শাসনকে নস্যাৎ করে চলে, এবং জনসাধারণের ওপর চালায় অকথ্য অত্যাচার।

যাহোক ঝগড়াটা বেধেছে একগাছি বিদেশি মুক্তোর মালা নিয়ে। মালাখানি রাজরানিকে উপহার দিয়ে রাজাধিরাজের খাস পেয়ারা বান্দা হবার উদ্দেশ্যে উভয় টাউটই অলংকারখানি বাগাতে চায়। এ নিয়েই প্রথমে বচসা, এবং পরে গালমন্দের শুরু—

'মালাখানি আমি আগে দেখেছি।'

'আমি আগে পছন্দ করেছি।'

'তুই একটা মিথ্যুক।'

'তুই একটা জোচ্চোর।'

ঠিক এমনি সময় সেই কঞ্জুষের ছেলে বেআক্কেল অলংকারের দোকানটির সামনে দিয়ে যাচ্ছিল। রাজবাড়ির দুই চাঁই-এর মাঝে ঝগড়া বেধেছে দেখে 'ওরে বাপরে' বলে সটকে পড়ার উপক্রম করতেই বেচারি বেআক্কেলের চোখ পড়ল আক্কেল গুড়ুম দোকানটির ওপর। সর্বনাশ! স্বয়ং আক্কেল আলী ঈগলের মতো তার দিকে অপলক দৃষ্টিতে চেয়ে আছে। সঙ্গে সঙ্গে তার সেই অঙ্গীকারপত্রের কথা মনে পড়ে গেল। ভয়ে বিবর্ণ বেআক্কেলের হাত-পা মুহূর্তে অবশ হয়ে এল। হায় খোদা! রাজার চেলা হোক আর আসমানের ফেরেস্তাই হোক, এখন তামাশাটা না-দেখে কেটে পড়ার অর্থই হবে পুরো একশোটি টাকা জরিমানা।

অতএব? উপায় নেই। একান্ত চিত্তে বিবাদের দৃশ্যটা দেখে যেতে লাগল হতভাগ্য বেআক্কেল। ওদিকে আর কাউকে না-দেখে কলহরত ফেউ দুজনের একজন একপর্যায়ে ছুটে এসে বেআক্কেল মিয়াকে ধরে অনুরোধ করল—

'ওই আগে আমাকে মিথ্যুক বলে গাল দিয়েছে। তোমাকে কিন্তু আমার পক্ষে সাক্ষ্য দিতে হবে। মনে রেখো আমি মহারাজাধিরাজের ডানের উজিরের লোক।'

এই দেখে অপর ফেউটিও দৌড়ে এসে বেআক্কেলকে একই অনুরোধ করল,

'দেখেছ তো মিয়া? প্রথমে ও-ই আমাকে জোচ্চোর বলে গাল দিয়েছে। তোমাকে কিন্তু আমার সাক্ষী হতে হবে বলে রাখলাম। ভুলে যেও না আমি মহারাজাধিরাজের বামের উজিরের খাস লোক।'

প্রথম ফেউ ফোড়ন কাটল,

'চিন্তা করে দেখ মিয়া। আরশুলাও পাখি—বামের উজিরও উজির।'

দ্বিতীয় ফেউ তার জবাবে বলল—

'কান খুলে একটু শুনে নাও মিয়া ভেতরের সংবাদ। আসলে বামের লাঠিটির ওপরই ভরসা কিঞ্চিৎ বেশি রাখেন আমাদের মহারাজাধিরাজ।'

বেচারি বেআক্কেল দুই যোদ্ধার মাঝখানে পড়ে ভয়ে বিবর্ণ হয়ে গেল। কোনোমতে শুধু বলতে পারল—

'ঠিক আছে ভাই সাহেবান, সব হবে। আমি তো সবই দেখলাম। এখন দয়া করে আপনারা ধৈর্য ধরুন।'

বেআক্কেল মিয়ার এই বেসামাল অবস্থা দেখে আক্কেল আলী তারিয়ে তারিয়ে গোঁফে তা দিচ্ছিল। বেআক্কেলও জবাবে তাচ্ছিল্যের হাসি হাসতে হাসতে ঘটনাস্থল ত্যাগ করল। ভাবল, সে আক্কেল আলীকে বেশ এক হাত দেখিয়ে দিল। ঝগড়ার তামাশাটা উপভোগ করল। বখিল বাপের শতটাকার লোকসান ঠেকাল। অথচ কেউ তার কেশাগ্রও স্পর্শ করতে পারল না। নিজের এই বিচক্ষণতায় তৃপ্ত হয়ে সে পাশের তৃপ্তি হোটেলে ঢুকে গোস্ত-পরোটার হুকুম জারি করে দিল। গোটা একটা টাকা খরচ করে ফেললেও বাবা আজ তাকে কিছুই বলতে পারবে না। কেননা, কঞ্জুষটার তবু তো নেট নিরানব্বই টাকা লাভ থেকে যাবে।

পরম পরিতৃপ্তির সঙ্গে পেটে হাত বুলোতে বুলোতে শেষবেলা বাড়ি পৌঁছুলে বাপ তো তাকে এই মারে কি সেই মারে—

'হতচ্ছাড়া আহাম্মক! তুইই আমাকে ডোবালি।'

'তোমাকে ডোবালাম? বাবা তুমি জানো না তোমাকে আজ আমি কেমন বাঁচালাম। রীতিমতো জানের ঝুঁকি নিয়ে বিরাট এক ঝগড়া দেখে তোমার বলতে গেলে একশো টাকা মুনাফা করে দিলাম।'

বেআক্কেল আলীর জবাবে কঞ্জুষ মিয়া তার মুখ ভেংচিয়ে উদ্‌গার করল—

'মুনাফা করে দিলাম! এখন রাজার ডানের উজির পেয়াদা পাঠিয়েছেন—তাঁর চেলার পক্ষে তুই সাক্ষী না হলে আমার সমস্ত বিষয়সম্পত্তি লুটতরাজ করে নিয়ে যাবে।'

'তাহলে আর ভয় কী বাবা। তুমি নিশ্চিন্ত থাকো। তাঁর চেলার পক্ষেই সাক্ষ্য দেব আমি।'

'আহ্! কেতার্থ হয়ে গেলাম। ওদিকে যে বামের উজির নফর পাঠিয়েছেন—তাঁর চামুণ্ডার পক্ষে সাক্ষী না হলে বাপ-বেটা দুটোরই মুণ্ডু কেটে ফেলে দেবে।'

'তবে তো ভারি মুশকিল হয়ে গেল বাবা! এখন উপায়?'

'উপায় আমার মাথা আর তোর মুণ্ডু। পেয়াদা বিদায় করতেই দেড় টাকা করে আমার তিনটি টাকা খসে গেল।'

'কিন্তু বাবা, তোমার এই তিন টাকার বখশিশ বড়, না একশো টাকার জরিমানা বড়? আমি কী করব, আক্কেল আলী যেমন শ্যেনদৃষ্টিতে আমার দিকে তাকিয়েছিল—'

'তুই ব্যাটা আগে আক্কেল কিনতে গিয়েছিলি কেন ফক্কড়টার কাছে? তুই-ই তো আসল নষ্টের মূল।'

'সে যাহোক বাবা, এখন যে ঘর-বাড়ি মাথা-মুণ্ডু সবই যায়। শোনো আব্বা! এ-অবস্থায় মাথা গরম না করে বরং চলো আবার আক্কেল আলীর দোকানেই যাই। গর্দান বাঁচানোর মতো কোনো আক্কেল যদি কিনতে পাওয়া যায়।'

'না গিয়ে আমার মূল্যবান পরাণটা দেব নাকি? তোর মতো উল্লুকের জানের নাহয় কোনো দাম নেই—'

'চলো বাবা, তাহলে শিগগির চলো। আমার জানের না থাক, সময়ের দাম বড় বেশি এখন। চলো।'

ছেলেসহ কঞ্জুষকে তার দোকানে ঢুকতে দেখে আক্কেল আলী পাকা ব্যবসায়ীর মতো এমন আন্তরিক অভ্যর্থনা জানাল যেন তাদের জন্যই অপেক্ষা করে সে বসেছিল। বাপ-বেটার বিপদের বিবরণ শুনে মুখে মিষ্টি হাসি ছড়িয়ে আক্কেল আলী বলল—

'তোমাদের জানমাল বাঁচানোর মতো অব্যর্থ আক্কেল তো আমার কাছে আছে কঞ্জুষ মিয়া। কিন্তু দাম পড়বে পাকা দুশো টাকা। একটি পয়সাও কম হবে না।'

'বিপদে যখন পড়েছি তখন আপনি যা চাইছেন তাই দেব আক্কেল সাহেব। জান না পারেন, অন্তত আমার জীবনের মেহনতের সম্পত্তিটা বাঁচিয়ে দিন দয়া করে।'

সেদিনের সেই গোঁয়ার-গোবিন্দ কঞ্জুষটার অসহায় কাকুতি মিনতিতে আক্কেল আলীর পুরনো ক্ষোভ উবে গেল এবং সান্ত্বনার সুরে বলল—

'বিপদে অধীর হতে নেই ভাই। তোমাদের বিপদে আপদে সাহায্য করার জন্যই তো এই দোকান খুলে বসে আছি। দামটা দিয়ে দাও, ব্যবস্থা দিয়ে দিচ্ছি। সব ঠিক হয়ে যাবে।'

দামটা বুঝে নিয়ে আক্কেল আলী তার ঘরের কোণে সাজানো টুল টেবিলে বসে একটুকরো কাগজ টেনে ব্যবস্থা লিখে এনে দিল। কাগজখানি হাতে নিয়ে বেআক্কেল কম্পিত কণ্ঠে পড়ল—

'রাজদরবারে হাজির হয়ে বেআক্কেল পাগলের মতো বকিবে।'

ব্যবস্থা শুনে কঞ্জুষের তো চক্ষু চড়কগাছ—

'এতেই আমাদের জানমাল বাঁচবে আক্কেল সাহেব?'

'বাঁচতেই হবে। তোমাদের বড় সৌভাগ্য যে আমাদের রাজাধিরাজের আক্কেলও তোমার এই বেআক্কেল ছেলের চাইতে এক রত্তি বেশি নয়। সাক্ষীকে পাগল জ্ঞান করে মুহূর্তে তাড়িয়ে তো দেবেই। উল্টো দুই উজিরকেই সমানে বকুনি লাগাবে।'

আক্কেল কিনে বাড়ি ফেরার পথে কঞ্জুষ সারাক্ষণ তার পুত্রকে এই বলে গঞ্জনা করল—

'লোকে পুত্রকে বলে পুত্রধন। আর তুই আমার এমন ধন যে তোর জন্যেই এমন দুর্দিনে আমার দুশো তিন টাকা চার আনা গচ্চা গেল। আজ যদি শুধু একটি বলদ থাকত আমার, এই মুহূর্তে তোকে আমি ত্যাজ্যপুত্র করে ছাড়তাম।'

যাহোক, পরদিন ঠিকই বেআক্কেলের ডাক পড়ল রাজভবনে। দুই উজিরের দুই পোষা গুণ্ডা এসে বেআক্কেলের দুই কান ধরে টানা-হ্যাঁচড়া করতে করতে নিয়ে গেল।

রাজদরবারে পৌঁছে গুণ্ডাদের হাত থেকে মুক্তি পেতেই বেআক্কেল বিদঘুটে এক গান গাইতে তাধিন-তাধিন নাচ জুড়ে দিল।

পাগল রাজার ছাগল উজির
ব্যাঘ্র আমার বাপ।

(এই) একুবপুরে বেকুব সবাই
তাই তো মোদের পাপ॥

বেআক্কেলের বেশরম কাণ্ডকারখানায় রাজাধিরাজের দুপাশে উপবিষ্ট আমির, ওমরাহ, হোমরা, চোমরা, চেলা-চামুণ্ডার দল কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে গেল। আর স্বয়ং রাজাধিরাজ রাগের মাথায় আচমকা গড়গড়ার নলটা কামড়ে ভেঙে ফেললেন। এবং ক্রোধে লম্ফঝম্ফ দিতে দিতে সুউচ্চ সিংহাসন থেকে পড়ে গিয়ে মুখ দিয়ে ফেনা ছেড়ে দিলেন। এটাও-যে বিশেষ এক-ধরনের আদেশ, বেআক্কেল সেটা হাড়ে হাড়ে টের পেল যখন উপস্থিত মোসাহেবের দল তাকে ঠ্যাঙাতে ঠ্যাঙাতে রাজভবন থেকে বের করে দিল।

দুশো টাকায় কেনা আক্কেলটুকু সম্পূর্ণ সার্থক হয়েছে দেখে কঞ্জুষ তবু টাকার শোকটা ভুলতে পারল।

কিন্তু বেচারা জানত না যে তার এই স্বস্তি নিতান্ত ক্ষণস্থায়ী। মাত্র দুদিন পরই বামের উজিরের চাঁইটা স্বয়ং এসে কঞ্জুষকে শাসিয়ে দিয়ে গেল যে তার সঙ্গে এ চালাকির যোগ্য প্রতিশোধ সে নেবেই। সে ভালো করে জানে বেআক্কেল আসলে আদৌ পাগল নয়। সে স্বয়ং রাজাধিরাজের সঙ্গে ধাপ্পাবাজি করেছে। ডানের উজিরের ফেউটি এসেও একই মর্মে চোখ রাঙিয়ে গেল।

কঞ্জুষের মাথায় আবার যেন আকাশ ভেঙে পড়ল। ছেলেকে আর বকাঝকা না করে সে নীরবে প্রহার শুরু করে দিল। মারের মুখে জীবনে প্রথমবারের মতো বেআক্কেলের মাথাই খুলে গেল। রুখে দাঁড়িয়ে বাপকে আজ সে পাল্টে শাসিয়ে দিল—

'দেখ বাবা, তোমার অবিচার-অত্যাচার সারাজীবন নীরবে সয়ে গেছি। এক্ষুনি রাজভবনে গিয়ে আমি সোজা বলে দেব যে যা-ই আমি করেছি সব তোমারই কুমন্ত্রণায়।'

বেআক্কেলের এই দুঃসাহসী প্রতিবাদ দেখে এবং ভয়াবহ পরিকল্পনার কথা শুনে বাপ বেচারি হাউমাউ করে কেঁদে উঠে বিলাপ জুড়ে দিল।

'আমার একমাত্র সন্তান হয়ে তুইও আমার সঙ্গে শত্রুতা করবি? হায়রে আমার কপাল! দুনিয়াতে আমার বুঝি আর কেউ নেই রে খোদা!'

পিতাকে এমনি ভেঙে পড়তে দেখে সরল গোবেচারা ছেলের অনুতাপ হল। বলল—

'এখন ভেঙে পড়লে তো চলবে না বাবা। বসে বসে হা-হুতাশ না করে আক্কেল গুড়ুমে গিয়ে আরেকটা আক্কেল কিনে নিলেই সব ঠিক হয়ে যাবে। আক্কেল আলীর ওপর আমার পুরো আস্থা আছে।'

ছেলের আন্তরিক আশ্বাসে বাবার যেন ধড়ে প্রাণ ফিরে এল। চোখের পানি মুছতে মুছতে তার সারাজীবনের কৃপণতার সঞ্চয় নগদ টাকার পুঁটলিটি মাটি খুঁড়ে বের করে নিয়ে শহরের উদ্দেশে রওনা দিল।

এই নতুন বিপদের বিবরণ শুনে আক্কেল আলী বেশ কিছুক্ষণ গম্ভীর ধ্যানে মগ্ন হয়ে রইল। এদিকে আশা-নিরাশার দোলায় উৎকণ্ঠিত কঞ্জুষের ধৈর্যের বাধ ভেঙে গেল। হুট করে আক্কেল আলীর পা দুখানি জড়িয়ে ধরে বুড়ো ডুকরে কেঁদে উঠল—

'শুধু এবারের মতো উদ্ধার করে দিন আক্কেল সাহেব! আর আপনাকে বিরক্ত করব না।'

অবশেষে মৃত্যুর মতো কঠিন শীতল কণ্ঠে দেবতার মতো অমোঘ বাণী দান করল আক্কেল গুড়ুমের স্বনামধন্য প্রোপ্রাইটর আক্কেল আলী—

'হ্যাঁ, বাঁচাতে অবশ্য পারি। তবে এবার থেকে হাজার টাকা দাম পড়বে। আমার নিজের জীবনেরই ঝুঁকি আছে এ-ব্যবস্থায়।'

টাকার অঙ্কটা শুনে কিন্তু পিতাপুত্র দুজনেই সমানে কিচিরমিচির করে উঠল,

'আমরা আপনার বহু পুরনো বাঁধা খদ্দের। কিছু আসান করুন ভাই সাহেব। অন্তত পাইকারি রেটটা ধরে দিন।'

'কথাটা অবশ্য নেহাত ফেলে দেয়া যায় না। আমার এই দোকানখানি খোলার তারিখ থেকেই বলতে গেলে তোমরা আমার কাস্টমার। ঠিক আছে। একেবারে অর্ধেক করে দিলাম। পাঁচশো টাকা দাও।

পাঁচশোটি টাকা গুনে ট্যাকে ভরে আক্কেল আলী ত্বরিত ব্যবস্থা লিখে দিল, না উঠেই—

'রাজার নিকট সকল সত্য প্রকাশ করিবে।'

ব্যবস্থা শুনে আতঙ্কে আঁৎকে উঠল পিতা এবং পুত্র।

'আপনি কী বলছেন আক্কেল সাহেব? সত্যকথার কি কোনো মূল্য আছে এই অমানুষ রাজার কাছে? আপনি শিক্ষিত মানুষ, আমাদের থেকে অনেক বেশি জানেন। আপনি কি ভুলে গেছেন যে, যুবরাজ থাকতে ডাকাতি-গুণ্ডামি ছাড়া অন্য কোনো শিক্ষাই গ্রহণ করেনি এই রাজা। ভাই সাহেব, দয়া করে আপনি কোনো বিকল্প ব্যবস্থা দিন। সত্য বললেই যে খেপে যায়, তার কাছে মিথ্যা না বললে গর্দান থাকবে না।'

'আলবৎ থাকবে। আমার ওপর আস্থা রাখতে পারো কঞ্জুষ মিয়া। আদ্যোপান্ত সকল ঘটনার বিশদ বিবরণ দিয়ে বেআক্কেল বিশেষ করে আমার কথা উল্লেখ করবে রাজার কাছে; বলবে, পাগলামি জাহির করার আক্কেলটুকু তাকে আমিই দান করেছিলাম। তারপর যত বিপদআপদ সবই আমার। যাও।'

উঠে যাবার মুখে বেআক্কেল আবার এক বেমক্কা প্রশ্ন করে বসল—

'দুশো টাকা নগদ দাম নিলেও কি দান হয়?'

'নিয়মিত আক্কেল কিনতে কিনতে তুমি তো দেখি বেশ সেয়ানা হয়ে উঠেছ হে। ঠিক আছে। বলবে যে আমি আক্কেল বিক্রি করেছি।'

বেশ অপ্রস্তুত বোধ করল আক্কেল আলী।

কিছুদিন পর ঠিকই বেআক্কেলের ডাক পড়ল রাজভবনে। আগাগোড়া ঘটনা সবিস্তারে বর্ণনা করে সে সাময়িকভাবে ছাড়াও পেল। তবে আক্কেল আলীর হিসাব মতোই রাজাধিরাজ তাকে তড়িঘড়ি তলব করে পাঠালেন।

দারুণ এক উৎকণ্ঠা নিয়ে আক্কেল আলী রাজভবনে হাজির হতেই রাজার কূটমন্ত্রণা বিশেষজ্ঞ আমির তাকে এক খাসকামরায় নিয়ে হাজির করল। রাজাসাহেবের রাজনীতি বিষয়ক গুরুত্বপূর্ণ শলাপরামর্শের গোপন কক্ষ এটা। বিলাসী তামাক সেবনরত রাজাধিরাজ আক্কেল আলীর প্রতি রহস্যময় দৃষ্টি নিক্ষেপ করতেই গড়গড়ার গুড়ুক গুড়ুক শব্দ বন্ধ হয়ে গেল। আলবোলার বক্র নলটি নামিয়ে বামহস্তে ধারণ করে মহারাজা চিৎকৃত কণ্ঠে প্রশ্ন ছুড়লেন—

চিরায়ত গ্রন্থমালা

এবং

চিরায়ত বাংলা গ্রন্থমালা

শীর্ষক দুটি সিরিজের আওতায়
বাংলাভাষাসহ পৃথিবীর বিভিন্ন দেশ
ও ভাষার শ্রেষ্ঠ রচনাসমূহকে
পাঠক সাধারণের কাছে সহজলভ্য করার লক্ষ্যে

বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্র

একটি উদ্যোগ গ্রহণ করেছে।

এই বইটি **'চিরায়ত বাংলা গ্রন্থমালা'**র

অন্তর্ভুক্ত।

বইটি আপনার জীবনকে দীপান্বিত করুক।

বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্র